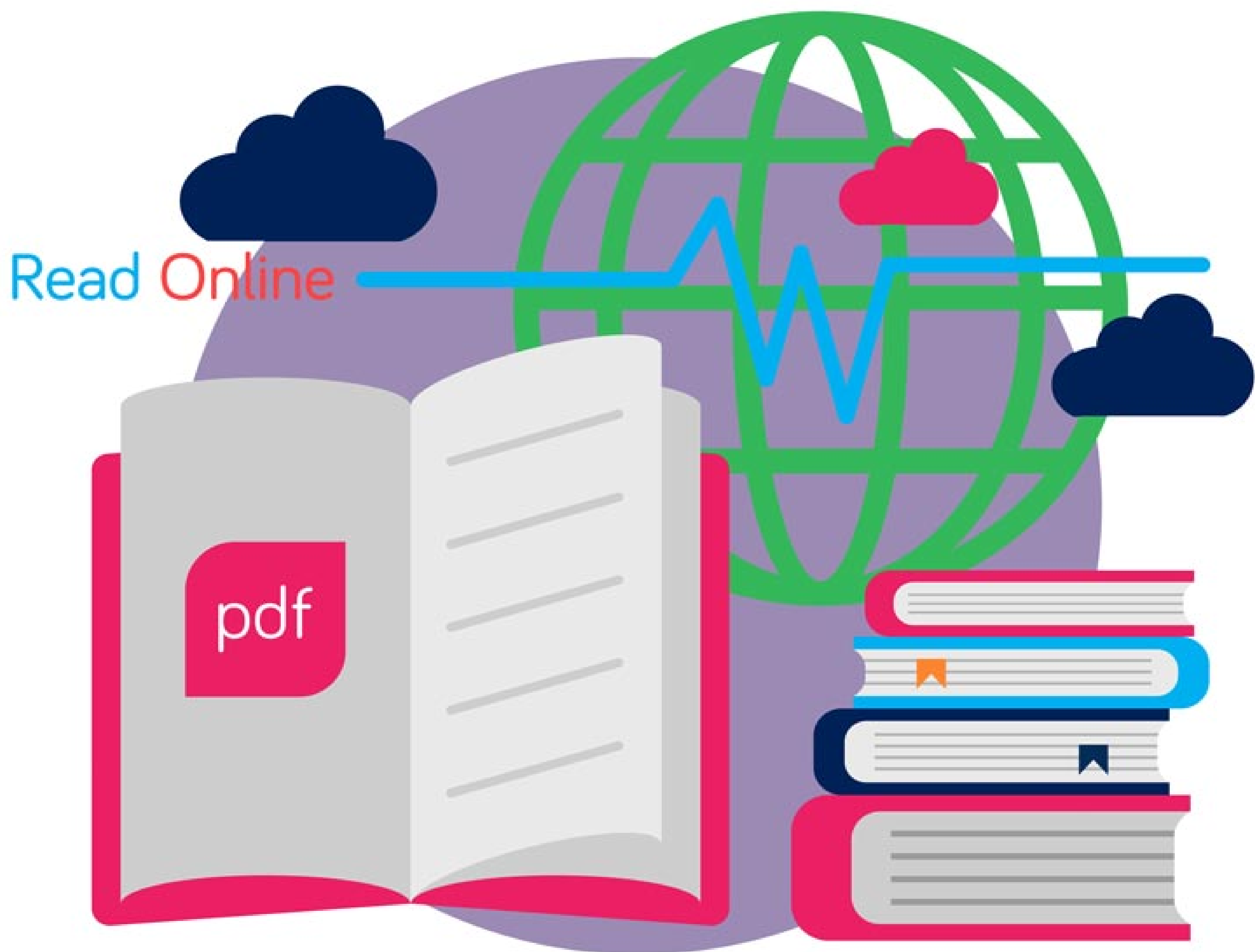
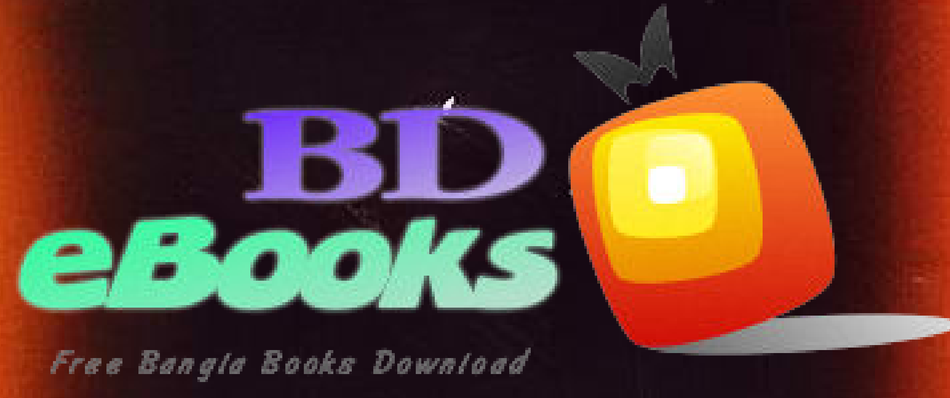


E-BOOK





এতদিন কোথায় ছিলেন

আনিসুল হক

উৎসর্গ

প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ, আপনাকেই



উপক্রমণিকা

এই আখ্যান রচনাকালে দুই হাতে গ্রহণ করেছি জীবনানন্দ দাশের প্রধানত ইংরেজিতে লেখা দিনলিপি ও সেসবের ভূমেন্দ্র গুহ প্রণীত টীকা-টিপ্পনি থেকে, কবির গোপন বাক্স থেকে উদ্ধার করা জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত গল্প-উপন্যাস—যেগুলোর অনেকগুলোকেই মনে হয় তাঁর আত্মজীবনীরই অন্যতর রূপ—সেসবের নির্বাচিত অংশ থেকে, আর কবির বিভিন্ন নিকটজনের স্মৃতিচারণা থেকে। কবির প্রকাশিত কবিতা বা অন্যতর রচনা থেকে তো বটেই। বইয়ের শেষে সহায়ক গ্রন্থের একটা তালিকা দেওয়া হলো। সবচেয়ে বেশি ঋণ বোধ হয় নিখাদ জীবনানন্দ-প্রেমিক ও গবেষক ভূমেন্দ্র গুহর কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি। উপন্যাস হিসেবে এর প্রথম মুসাবিদাটি *প্রথম আলো ঈদসংখ্যা* ২০০৮-এ বেরোনোর পর যাঁরা তাঁদের ভালো লাগার কথা জানিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন, এই সুযোগে তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।
প্রথম আলোর জামিল বিন সিদ্দিক প্রথম ভূমেন্দ্র গুহ রচিত *আলেখ্য: জীবনানন্দ* বইটির খবর ও কপি আমাকে দিয়েছিলেন। আর কলকাতা থেকে বই জোগান দিয়ে সহায়তা করেছেন *প্রথম আলোর* কলকাতা প্রতিনিধি অমর সাহা। তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আনিসুল হক
ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৯



আপনার পূর্বপুরুষেরা, মুন্সিবাড়ির বিখ্যাত মুন্সিরা, কীর্তিনাশার পারে বিক্রমপুরের গাউপাড়ায় যখন থাকত, তখন তারা কেবল দোর্দণ্ডপ্রতাপ কীর্তিমানই ছিল না, ছিল ভীষণ রূপবানও। তাদের রূপের ছটায় থাকতে না পেরে আকাশ থেকে পরীরা নেমে আসত পদ্মার চরে। আপনার পূর্বপুরুষদের একজন এমনই সুপুরুষ ছিল যে তাকে পরীরা উড়িয়ে নিয়ে যেত রোজ রাতে, জোছনা-গলা বাতাস কেটে কেটে, ধানক্ষেত আর দূর্বাঢাকা ঘাটের ওপর দিয়ে। উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তারা তাকে শোয়াত মেঘপালঙ্কে, তার পদসেবা করতে পেরে ধন্য হতো অসম্ভব সুরূপা সেই পরীর দল। তারপর ভোরবেলা কুয়াশামাখা বৃক্ষের কোনো বিস্তৃত ডালে, কিংবা শিশিরধোয়া ঘাসের বিছানায় পরীরা নামিয়ে দিয়ে যেত তাকে। রাত্রিবেলা খোঁজ খোঁজ, কোথাও নেই ওই সুপুরুষ মুন্সিটি, সকালবেলা তাকে পাওয়া গেল গাছের ডালে শোয়া, কিংবা মুখে মধুর হাসিটি নিয়ে সে ঘুমুচ্ছে তৃণশয্যায়। তার কাপড়চোপড় নতুন, শরীরে অপার্থিব পাগল করা গন্ধ আর পকেটে অজানা দেশের সোনার মোহর।

আপনার পিতামহীর কাছে এই গল্প আপনারা ঢের শুনেছেন শৈশবে। বরিশালের সর্বানন্দ ভবনে, কিংবা পুরোনো বাড়িতে বসে। খোলা আকাশের নিচে পিতামহীকে ঘিরে ধরে আপনারা সন্ধ্যাবেলা এই সব গল্প শুনতেন। গল্প শুনতে শুনতে—আরও অনেক গল্প, রূপকথার, শিকারের, ভ্রমণের—ঠাকুরমার কাছে, মতির মার কাছে, শিকারি রাজমিস্ত্রি মুনিরুদ্দির কাছে...আপনি পরিব্রাজন করতেন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্তটা পথ, অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের...হাজার বছরের পথ, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগর হয়ে...কত যে হেঁটেছিলেন আপনি...আপনার পূর্বপুরুষের ওপর ভর করা পরীরা আপনার শান্তি কেড়ে

নিয়েছিল, আপনার পিঠে তারা লাগিয়ে দিয়েছিল দুটো অদৃশ্য ডানা, সেই ডানা আর কেউ দেখতে পেত না, অভিশপ্ত ওই ডানাজোড়ার কবলে পড়ে আপনি হয়ে উঠেছিলেন কবি; সেই কবি, আকাশে কাতর আঁখি তুলে যিনি দেখবেন ঝরা পালকের ছবি, যিনি কীটের বুকের ব্যথাও অনুভব করবেন; আপনার মাথার ভেতর স্বপ্ন নয় প্রেম নয় কোনো এক বোধ কাজ করতে থাকবে, আপনাকে ঘুরে ঘুরে কথা বলবে...আপনাকে ক্লান্ত, ক্লান্ত করে তুলবে আরও এক বিপন্ন বিস্ময়; তবু আপনাকে একদিন দু দণ্ডের জন্যে হলেও শান্তি দেবে রূপকথার অপার্থিব নারী নয়, ইতিহাসের ব্যাবিলনের মিসরের কেউ নয়, একেবারেই বাংলার একটা ছোট্ট শহরের একটা অখ্যাত নারী—বনলতা সেন।

আপনারও মনে হবে, এই মেয়েটির, বা এই রকম কোনো কোনো অখ্যাত নারীর কী যে জাদুকরি ভূমিকা থাকে একেকজন কবিপুরুষের জীবনে! স্বীকার করতেই হবে আপনাকে যে, 'এই মেয়েটি আমার জীবনকে করে তুলেছিল কী ভীষণ দুরতিক্রম্য। এই নারীটি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল বলেই বৈষ্ণব কবিতা, কিশোরী প্রেম ও অনেক বিদেশি সাহিত্যের অন্ধকার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার কাছে অপরূপ হয়ে আছে। রূপ ও প্রেমের বেদনা, পাপ ও অভূতপূর্বতা বুঝতে পেরেছি।' পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে আধেক কথা শুনবে কি শুনবে না, কিন্তু একবার বেদনার দিকে তাকিয়ে, আরেকবার নক্ষত্রের দিকে; অনেক কবিতা লিখে যেতে হবে যুবকদের।

প্রিয় জীবনানন্দ দাশ,
আপনার জন্যে আমার দুই চোখে দুই ফোঁটা জল। আর দুই ফোঁটা জলের দুই রকম রং। একটার রং হলুদ। আরেকটার রং সবুজ। আপনাকে নিয়ে একটা উপন্যাস ফাঁদব বলে বসেছি। ১৯৫৪ সালের ৫৪ বছর পর—আপনার মৃত্যুর পর আরও ৫৪টা কার্তিক চলে গেছে—আপনার জন্মের ১০৯ বছর পর, একজন প্রায় না-অস্তিত্ব লেখক কম্পিউটারের সামনে বসে আপনার কথা লিখতে গিয়ে, আপনার কথা ভাবতে গিয়ে দু চোখে অকারণ জল নিয়ে আসে। অকারণ! না, ঠিক অকারণ নয়। এক ফোঁটা জল সে এনেছে আপনার অসার্থক প্রেমের জন্যে। আপনার বনলতার

জন্যে। আপনার ওয়াইয়ের জন্যে। আপনার শচীর জন্যে। আপনার শোভনার জন্যে। আপনার শান্তির জন্যে। পৃথিবীর সবাই প্রেমের গল্প পছন্দ করে। দি ওয়ার্ল্ড লাভস দ্য লাভার্স। আর যখন আমরা প্রেমের গল্প পড়ি, তখন চাই প্রেমিক তার প্রেয়সীর সঙ্গে মিলে যাক। আজ আমি যে গল্প বুনতে বসেছি, তাতে নায়ক আপনি। আর নায়িকা? আপনার বনলতা সেন। শুনে আপনি মৃদু হাসবেন জানি। বিব্রত হয়ে তাকিয়ে থাকবেন অন্যদিকে। তারপর আড়চোখে তাকিয়ে যদি আমার চোখেও দেখতে পান কৌতুক, ভীষণ জোরে হেসে উঠতে পারেন আপনি। না, এ লঘু বিষয় নয়। আপনি নাও হাসতে পারেন। আপনি বিষণ্ন বোধ করতে পারেন। হয়তো বলতে পারেন, বনলতা নামে তো সত্যি সত্যি কেউ ছিল না। হয়তো নীরব থেকে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার বনলতার, কিংবা সুচেতনার বা সুরঞ্জনার, কিংবা সরাসরি বলেই ফেলি, শোভনার বা ওয়াইয়ের আর যে মিল হলো না, মিলন হলো না, সে কথা ভেবে আর সব গল্পগ্রস্ত পাঠকের মতো, চলচ্চিত্রের মগ্ন দর্শকের মতো আমারও চোখে এক ফোঁটা হলুদ জল।

আরেক ফোঁটা জল, সবুজ জলফোঁটাটা, এই জন্যে যে, আপনি জেনে যেতে পারলেন না, বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি আপনি; আর আপনি যে পাণ্ডুলিপি জীবিতাবস্থায় প্রকাশই করেননি, পূর্ব-বাংলার বাঙাল যে কবিতাগুলো বাক্সবন্দী রেখেই একটি মোটরকারের গাড়লের মতো কেশে ওঠা কিংবা হাইড্র্যান্ট আর কুষ্ঠরোগী আর কামানের ক্ষোভ আর রিস্টওয়াচ নিয়ে কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছিল চতুর্মুখী আক্রমণের মুখে, সেই ধূসরতর পাণ্ডুলিপি পরে প্রকাশিত হয়েছিল *রূপসী বাংলা* নামে, সেইটি বাংলার মানুষ তাদের প্রাণের গভীরে উচ্চারিত মর্মধ্বনি হিসেবে গ্রহণ করেছে। আপনি যাকে দেখে গেছেন পূর্ব-পাকিস্তান, তা এখন স্বাধীন বাংলাদেশ, একাত্তর সালে পূর্ব-বাংলার মানুষেরা যখন প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করছিল পাকিস্তানি দখলদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে, তখন আপনার 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কিংবা 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাগুলো পরম প্রেরণা হয়ে বেজেছিল মুক্তিকামী কোটি বাঙালির বুকে আর মুখে। আপনি মারা যাওয়ার পর বুদ্ধদেব বসু যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে আপনার স্মরণসংখ্যার জন্যে লেখা চেয়েছিলেন, সুধীন দত্ত বলেছিলেন, যিনি কবি নন, তার জন্যে

স্মরণসংখ্যা করবার কী দরকার! আজ আপনার মৃত্যুর ৫৪ বছর পর কেবল দুই বাংলা নয়, পৃথিবীজুড়ে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, আপনি, জীবনানন্দ দাশই রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষার সবচেয়ে শক্তিশালী কবি। আপনার তথাকথিত দুরূহ পঙ্‌ক্তিগুলো এখন বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন বাগ্‌ধারার অংশ হয়ে গেছে, পাখির নীড়ের মতো চোখ নিয়ে কেউ আর সজনীকান্তের মতো বিয়াকুল হয় না, উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা তারা নেমে আসতে দেখে জানালায় কিংবা মানচিত্রের ওপর; আপনার প্রতিষ্ঠা এত দূর যে, শুনলে আপনি আবার সেই হাসিটা হাসবেন, এখন লোকে নাটোরে গিয়ে বনলতা সেনের বাড়ি কোথায় খুঁজতে থাকে! আপনার জীবদ্দশায় এই কথাগুলো আপনি স্পষ্টভাবে জেনে যেতে পারেননি, কে-ই বা পারে, কিন্তু আরেকটু স্বীকৃতি আরেকটু তারিফ আরেকটু কম-আক্রমণ হয়তো আপনার প্রাপ্য ছিল, জীবনানন্দ দাশ। আপনার এই অযোগ্য অন্তেবাসীর এক চোখের সবুজ অশ্রুবিন্দু এই আফসোসটার জন্যে।



নাটোরের বনলতা সেন

প্রিয় জীবনানন্দ দাশ,

আপনার সঙ্গে বনলতা সেনের কোথায় দেখা হয়েছিল? কবে?

আপনি লেখক, প্রচুর গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন আপনি, অবশ্য প্রেমেন মিত্তিরদের মতো সিনেমার কাহিনী লেখার পথে আপনি যাননি, না গিয়েই ভালো হয়েছে; তবে সিনেমার গল্পলেখকেরা ভালো করে জানেন, নায়ক আর নায়িকার প্রথম দেখাটা কীভাবে হবে, সেটা লেখকের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সওয়াল। নায়ক কুকুরের তাড়া খেয়ে নায়িকার বাড়িতে উঠবে, নাকি, নায়িকা বৃষ্টিতাড়িত হয়ে ছুটে গিয়ে উঠবে নায়কের বারান্দায়—এই সব ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হয়ে যাওয়া দৃশ্যাবলি থেকে কী করে বেরোনো যায়, লেখককে তা নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয় বৈকি।

আপনার সঙ্গে বনলতা সেনের কবে কোথায় দেখা হয়েছিল, এ নিয়ে এই আখ্যানের লেখককে তো মাথা ঘামাতেই হবে।

কিন্তু, আপনাকে আগেই বলে রেখেছি, আপনি এখন আমাদের সবচেয়ে প্রিয় কবি, সবচেয়ে উদ্‌যাপিত কবি, আপনার জীবনীগ্রন্থের মার্কিন লেখক ক্লিনটন বি সিলি আপনাকে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার পোয়েট লরিয়েট, আর আপনার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা হিসেবে এখন মূল্যায়িত; কাজেই আপনার সঙ্গে বনলতা সেনের দেখাটা কোথায় হলো, কীভাবে হলো, তা নিয়ে অনেকেই ভাবিত। কেবল 'অধ্যাপক; দাঁত নেই, চোখে তাঁর অক্ষম পিঁচুটি'—তারাই নয়, আরও অনেক প্রেমময় বেদনানীল সহৃদয় পাঠক এবং

বিশেষ করে নাটোরবাসী আপনার সঙ্গে নাটোরের বনলতা সেনের সাক্ষাতের মুহূর্তটি নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কল্পনা করে থাকে।

তারা কী কী কল্পনা করে থাকে, আপনাকে একটু বলব সংক্ষেপে?

বলতে সাহস পেতাম না, যদি না জানতাম, আপনি লোকটা আদপে ছিলেন রসিক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঢের বুঝতেন, করতেনও, এবং হাসতে জানতেন, প্রাণখোলা হাসিই। যারা রসিকতা বোঝে না, যাদের উইট নেই, একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনার পর যাদের চোখে তাকালে উইটের বিদ্যুতের ঝলকানি পাওয়া যায় না, তাদের আপনি নাম দিয়েছিলেন 'দি আদার টাইপ'। আপনার ভ্রাতৃবধূ নলিনী দাশ ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেনের অধ্যক্ষা ছিলেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন বাণী রায়। *বনলতা সেন* প্রকাশেরও বছর আটেক পর বাণী রায়ের সঙ্গে আপনার কিঞ্চিৎ বন্ধুত্বমতো হয়েছিল। তিনি বলেছেন, আপনার মতো লজ্জাশীল ও সমাজবিমুখ কবির নিকটস্থ হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর মতো অনাত্মীয়া মহিলা যে লাভ করেছিলেন, তার কারণ তিনি আপনার সঙ্গে মিশেছিলেন একজন পুরুষের মতো করে। আপনি বাণী রায়কে দেখতে চেয়েছিলেন নিজের গরজেই। *শনিবারের চিঠিতে* বাণী রায়ের গল্প বেরিয়েছিল 'লুক্রেশিয়া' নামে। নলিনী দাশদের রসা রোডের বাড়িতে বাণীর সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা! আপনি তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলেছিলেন, 'আপনিই বাণী রায়?'

'হ্যাঁ।'

'লুক্রেশিয়া আপনার লেখা?'

'হ্যাঁ।'

সেই হলো বাণী রায়ের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয়। এরপর তিনি অনেকবার আপনার ল্যান্সডাউনের বাসায় গেছেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, আপনার রসবোধ কত তীক্ষ্ণ। ওই নারীর মধ্যে আপনিও সেটা পেয়ে গিয়েছিলেন বুঝি। তাই তো অল্প কথাতেই আপনারা পরস্পরের বক্তব্য বুঝতেন এবং হাসির সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে পারতেন। হয়তো কাউকে নিয়ে কথা হচ্ছে, বাণী রায় আপনার কাছে জানতে চাইলেন, 'উনি কী...?' আপনি জবাব দিতেন, 'আনফরচুনেটলি, দি আদার টাইপ।' এর মানে হলো, লোকটার সেন্স অব হিউমার একটু কম। আপনি যখন হিউমার করতেন, তখন শ্রোতার চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতেন সে বুঝল কি

না, সায় পাওয়ার পরই কেবল প্রাণখোলা উচ্চহাস্যে আপনি ফেটে পড়তেন। যে *শনিবারের চিঠি*তে আপনাকে নিয়মিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করা হতো, আপনাকে যারা আখ্যা দিয়েছিল 'গণ্ডার কবি', সেই পত্রিকাটাও আপনি নিয়মিত পড়তেন। বাণী রায় একদিন আপনাকে বলেছিলেন, 'বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। সজনীবাবু আপনার যে পাবলিসিটি করছেন, সে জন্য ফি চাইতে পারেন।'

'ঠিক বলেছেন।' আপনি সায় দিয়েছিলেন।

'একদিন আলাপ করবেন? অত হিউমারের ভক্ত আপনি?'

'হবে, হবে।' সেদিন আপনি বাণী রায়কে হাসিমুখে বলেছিলেন, 'সজনীবাবুকে বলবেন, এমনিভাবেই যেন আমার আরও প্রচার করেন। হা হা হা।' সেই হাসির প্রতিটি ধ্বনি বাণী রায়কে বলে দিয়েছিল, লুকোচুরি খেলায় *শনিবারের চিঠি*র সজনীকান্তের হার হয়েছে।

সজনীকান্ত সম্পাদিত *শনিবারের চিঠি* আপনার বিরুদ্ধে খুব লেগেছিল যা-হোক। একেবারে কোমরবন্ধনীর নিচে তারা আঘাত করতেন। 'ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে/ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে /অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে!' আপনার এই পঙ্‌ক্তিগুলান উদ্ধৃত করে সজনীকান্ত লিখেছিলেন, 'কবি সব করিয়াই দেখিয়াছেন। শুধু বিবাহ করিয়া মেয়েমানুষেরে দেখেন নাই। দেখিলে ভালো হইত, গরিব পাঠকেরা বাঁচিত।' শুনে আপনি নিশ্চয়ই আপনার সেই সূক্ষ্ম হাসিটা হেসেছেন। স্বীকার করতেই হবে, সজনীকান্ত ঠিক দি আদার টাইপের মধ্যে পড়েন না। রসবোধ আছে লোকটার।

আপনার রসবোধও অসম্ভব, জীবনানন্দ দাশ। ছিল রম্যতার গুণও। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আপনি আপনার *ঝরা পালক* কাব্যগ্রন্থটি পাঠিয়েছিলেন, বোধ করি আলোচনার আশায়। তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন, 'জীবানন্দবাবু, প্রেরিত পুস্তকখানা যথাসময়ে এসে পৌঁছেছে। বাড়ী বদল করেছি বোলে বড় গোলমালে ছিলাম। ঝরা পালক উড়তে উড়তে আমার গায়ে কি করে এল ভেবে পাই না...'

জবাবে আপনি লিখেছিলেন, "...উড়তে উড়তে 'গায় এসে লাগল'—নিশ্চয়ই চোখ বুজে ছিলেন,—কিম্বা চোখ বুজে আস্‌চিল—এ হেন সময় পালকের আক্রমণ। আমার মনে হচ্চিল ঝরা পালকের পল্‌কা ফুঁয়ে

আপনার ঘুম জমবে ভালো। কিন্তু জানতে পারচি পালকের অত্যাচারে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে। কিন্তু তবুও চোখে ঘুমের ঘোর ছিল,—তাই আমাকে জীবানন্দবাবু ব'লে সম্ভাষণ করেছেন। আমি কিন্তু জীবনানন্দবাবু,—বুঝলেন?"

হ্যাঁ, আপনার লেখার রম্যতার গুণের তারিফ করতে এটা উদ্ধৃত করছি বটে, পাশাপাশি আপনার আত্মসম্মানবোধ দেখে শ্রদ্ধাভিভূতও কম হচ্ছি না।

তবে সবচেয়ে নিদারুণ ব্যঙ্গশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে *শনিবারের চিঠি* যে নির্দয় আক্রমণ করেছিল, তার জবাবে। সজনীকান্ত দাস আপনার কবিতা উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন,

"একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
   সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায়!
মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়ে-মানুষের কাছে...

ভাইয়েরা না হয় তাদের বোনের কাছে আসিল, মানিলাম,—আট্‌কাইবার উপায় নাই—কবির তন্ময়তায় না হয় গাছও সুন্দরী হইল, বুঝিলাম—কবির ঘোর লাগিয়াছে—কিন্তু মেয়েমানুষ কি করিয়া নোনা হইল? নোনা ইলিশ খাইয়াছি বটে, কিন্তু কবির দেশে মেয়েমানুষেরও কি জারক প্রস্তুত হয়? কবি যে এত দিনে হজম হইয়া যান নাই, ইহাই আশ্চর্য!...

"কবি স্বীকার করিয়াছেন তিনিও একজন 'পুরুষ-হরিণ'। তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি!

মার্জিনে বন্ধুবর মন্তব্য করিয়াছেন, 'তুমি ছাগল!"

এর পরও উত্তর না দিয়ে হেসে ওঠা সত্যি অসম্ভব। আপনিই চুপ করে থাকেননি। একটা জবাব দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'কিন্তু বাংলাদেশে সজ্‌নে গাছ ছাড়াও যে গাছ আরো ঢের আছে—সুন্দরী গাছ বাংলার বিশাল সুন্দর-বন ছেয়ে রয়েছে যে সজ্‌নের কাছে তা অবিদিত থাকতে পারে...'

সজ্‌নে মানে যে সজনীকান্ত, সেটা বুঝে উঠে যে হাসিটা আমি হাসছি, তা আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে আশা করি।

আপনার হাস্যরস ও কৌতুকরসবোধের পরিচয় তো আপনার

কবিতায়ও ছড়িয়ে আছে। সেটা 'সমারূঢ়' কবিতা বা 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় তো আছেই; সুবিনয় মুস্তফীর আপনি যে প্রশংসা করেছিলেন, যে ব্যক্তি একই সঙ্গে বেড়াল আর বেড়ালের মুখে ধরা ইঁদুরকে হাসাতে পারত, সেখানেও স্পষ্ট।

আপনার ছোট ভাই অশোকানন্দের দিল্লির বাড়িতে একবার আপনারা বেড়াতে গিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সাল ছিল সেটা, পুজোর সময়। ওই বাড়িতে তখন নানা স্বজনের মেলা বসেছিল। দুটো বাথরুম, সকালবেলা কোনোটাই ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনার ছোট ভাই অশোক তাঁর ঘরের লাগোয়া বাথরুম বন্ধ দেখে আপনাকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'দাদা, তোমার বাথরুম খালি আছে কি?' আপনি তক্ষুনি জবাব দিয়েছিলেন, 'দিল্লির মসনদ কি কখনো খালি থাকে?'

এই কৌতুকপ্রিয়তা আর পরিহাসের গুণ আপনি পেয়েছিলেন আপনার মায়ের বংশ থেকে, উত্তরাধিকারসূত্রে। আপনাদের মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশ খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় অনেক হাসির গান আর ছড়া রচনা করেছিলেন। আপনি নিজেই মন্তব্য করেছিলেন, আপনার দাদামশায়ের অনেক লেখা ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেম, রঙ্গলাল প্রমুখকে মনে করিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তাঁর কিছু গান, লোকগাথা, লোককবিতা হয়তো কালের ধোপে টিকে যেতে পারে।

বরিশালে আপনাদের বাড়ির আশপাশে ছিল খ্রিষ্টান বসতি। বাড়ির কাছেই অক্সফোর্ড মিশন। প্রতি রোববার খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা মিশনের গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতেন আর ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করতেন।

আপনাদের বাড়িতে সুন্দরমালা নামে একজন বৃদ্ধা খ্রিষ্টান পরিচারিকা ছিলেন। বয়স বেশি, কাজকর্ম করতে পারতেন না তেমন, আপনার বাবা তাঁকে একখানি ছোট ঘর তুলে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই থাকতেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ছিল তাঁর বিশেষ আপন। আপনার বিয়ের পর বউকে তিনি দর্শনিও দিয়েছিলেন।

রোববার এলেই এই সুন্দরমালা ছুটতেন গির্জায় যাওয়ার জন্যে। তাঁর কাছে পাপ স্বীকার করতেন।

ফাদার ইংরেজ। তিনি ভালো বাংলা বলতে পারতেন না। ফাদার হ্যাভোক আপনাদের বৃদ্ধা ঝিকে বলতেন, 'প্রভু যীশু বলসেন, সকোলকে প্রেম করটে। টাই হামিও টোমাকে প্রেম করি। সুন্ডরমালা, সট্য, আমি

টোমাকে প্রেম করি।'

এসব কথা সবার কাছে সুন্দরমালা বলে বেড়াতেন। আর সবাই তাঁকে বোঝাত, 'ফাদার তোমার প্রেমে পড়ে গেছেন। তোমাকে তিনি বিয়ে করতে চান। কিন্তু তোমার যে দাঁত নেই। তুমি এক কাজ করো, দাঁত বাঁধিয়ে ফেলো। তাহলেই তিনি তোমাকে বিয়ে করবেন।'

পাপ স্বীকার করে ফেরার সময় সুন্দরমালা সবাইকে গালিগালাজ করতে করতে ফিরতেন। বুড়ো ঝি সুন্দরমালার গলা শুনলেই আপনি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেন। ভেতরের কৌতুক গোপন করে বলতেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? পাপ স্বীকার করতে বুঝি?'

সুন্দরমালা হেসে উত্তর দিতেন, 'হয়।'

'শুনলাম ফাদার হ্যাভোক তোমার জন্যে দাঁত বাঁধতে দিয়েছেন। তোমাকে কিছু বলেছেন এ ব্যাপারে?'

ওপাশ থেকে আপনার মা আঁচলে মুখ ঢেকে চাপা গলায় বলতেন, 'মিলু, থাম। বুড়ো মানুষটার সঙ্গে আবার লাগতে গেলি কেন?'

সুন্দরমালা রেগে গিয়ে বলতেন, 'হ্যাবোগ্যারে মরণদশায় পাইছে। দেহা করনের লাইগ্যা যত চেষ্টায় করি না ক্যান, হেডায় কি দেহা দেয়? না হামনে আহে। ক্যাবল আড়ালে আবডালেই রয়। রও, হেডারে একবার পাইয়া লই। হ্যার মতিগতি ভাল কইরাই বুইঝ্যা লইমু। বিয়া করনের ফিকির দেহায়—কাজের কালে ঢনঢন। বড় ফাদাররে কইয়া দেহামু নে মজাডা।'

আপনার মাতামহ যখন আপনাদের বাড়িতে আসতেন, স্নানের পর বাড়ির মেয়েরা তাঁকে পরতে দিতেন শাড়ি। তিনিও খুশি হয়েই শাড়িটা পরে নিতেন লুঙ্গির মতো করে। রসিক এই পুরুষটির সবকিছুতেই ছিল হাসিঠাট্টা রসিকতা, হাসির গান লিখেছিলেন তিনি অনেক। তিনি স্নান সেরে আসছেন, অমনি আপনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেন, বলতেন, 'কী হে চন্দরনাথ, শাড়ির পাড় পছন্দ হইছে? চুল আঁচড়ানোর কাঁকই পাইছ। তোমারে আর কী দ্যাওন যায়—কও।'

আপনার মা হাসি সামলানোর জন্য তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতেন। আপনার কথার উত্তরে দাদামশাই এক হাতে লাবণ্যকে, আরেক হাতে আপনাকে জড়িয়ে ধরে গান ধরতেন—

'বাজার হুদ্যা কিন্যা আইন্যা চাইলা
দিছি পায়,
তোমার লগে ক্যামতে পারুম হইয়া উঠছে দায়।
আরশি দিছি, চুড়ি দিছি, চুল বাঁধনের ফিতা দিছি,
ব্যালয়ারি চুড়ি দিছি, আর কী দেওন যায়?
বুড়া বুড়া কইয়া ক্যাবল, ক্ষ্যাপাইয়া ক্যান কর পাগল?
যহন বিয়া করছ ফ্যালবা কেমতে কইয়া দ্যাও আমায়।'

সুতরাং, কবি জীবনানন্দ দাশ, রসবোধ-উজ্জ্বল আপনাকে এইবার বলি, নাটোরের লোকেরা বনলতা সেন আর আপনাকে নিয়ে কী কিংবদন্তি ছড়িয়ে চলেছে!

একটা প্রচার হলো : আপনি যাচ্ছেন দার্জিলিং! ট্রেনে করে। তখনকার দিনে নাকি দার্জিলিং মেল যেত নাটোর হয়ে। একটা কামরায় একাকী বসে আছেন আপনি। নাটোর স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। এক বৃদ্ধ আরোহণ করলেন ট্রেনে, তার সঙ্গে অপরূপা এক তরুণী। আপনি তখনো আত্মমগ্ন। ট্রেন চলতে শুরু করল। চলন্ত ট্রেনের দুলুনিতে বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়লেন। কামরায় জেগে আছে শুধু দুটি প্রাণী।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

তখন গোধূলি। কনে দেখা হলুদ আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। তার মুখখানা দেখাচ্ছে শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতন। একরাশ ঘন চুল তার মাথায়।

আপনি বললেন, 'দার্জিলিং।'

'ওখানেই বুঝি থাকেন?'

'না। এবার কিছুদিন থাকব। এই প্রথম যাচ্ছি।'

'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

আপনার চোখে সেই কৌতুকের হাসিটা খেলে যায়। এতদিন কোথায় ছিলেন, এ যেন বাড়ি কই, তা জানতে চাওয়া নয়, এর অন্য কোনো মানে আছে।

আপনি মেয়েটিকে শুধান, 'আপনার সঙ্গে উনি কে?'

'উনি? আমার দাদা। ওনার নাম ভুবন সেন। নাটোরের বনেদি বাড়ি

সুকুলবাড়ি। দাদা ওখানকার ম্যানেজার।'

'আপনার নাম?'

'বনলতা সেন।'

সন্ধ্যার গায়ে কালো দোয়াত ঢেলে দেয় রাত। বাইরে স্টেশনে স্টেশনে জ্বলে ওঠে গ্যাসলাইটের আলো। সেই আলো একেকবার জানালাপথে এসে পড়ে ট্রেনের কামরায়, আরেকবার চলে যায়। একেকবার ভেসে ওঠে বনলতার মুখ, বিদিশার নিশার মতো চুলরাশি, পাখির নীড়ের মতো চোখ, আরেকবার হারিয়ে যায় অতলান্ত অন্ধকারের গহ্বরে।

মধ্যপথে একটা স্টেশনে নেমে যান বৃদ্ধ তার বোনসমেত।

তারপর থাকে শুধু অন্ধকার।

দ্বিতীয় যে গল্পকথাটা প্রচলিত আছে, সেখানেও বনলতা ওই ভুবন সেনেরই বিধবা বোন। নাটোরের বনেদি পরিবার সুকুলবাবুর বাড়িতে আপনি বেড়াতে গেছেন অতিথি হয়ে। এক দুপুরে এস্টেটের ম্যানেজার ভুবন সেনের বাড়িতে আপনার নেমন্তন্ন। আপনি বসে আছেন বিছানায়, সামনে দস্তরখান বিছিয়ে। মধ্যাহ্নভোজ। পরিবেশনের দায়িত্ব আর কারও নয়, ভুবন সেনের বিধবা বোন বনলতা সেনের। অবগুণ্ঠিতা বিধবা বালিকা বনলতা তার নগ্ন নির্জন হাতে পরিবেশন করছে। তার শাদা শাড়ির আড়াল ভেঙে হঠাৎই উঁকি দিল শ্রাবস্তীর কারুকার্যময় মুখখানি। আপনার ধ্যানভগ্ন ঘটল। এই অল্প বয়সে এই বৈধব্যবেশ কেন এই বালিকার! একসময়, খেতে খেতেই, কয়েকটা বাক্যবিনিময়ও ঘটল বটে। তারপর নাটোর ছেড়ে গেলেন আপনি। কোনো দিনও আপনি নাটোরে আর আসেননি বটে, কিন্তু তার মুখস্মৃতি স্থায়ীভাবে আঁকা হয়ে যায় আপনার মনের ক্যানভাসে। হাজার বছরের পথচলার ক্লান্তি যেন দূর করে দিয়েছিল ওই মুখখানি।

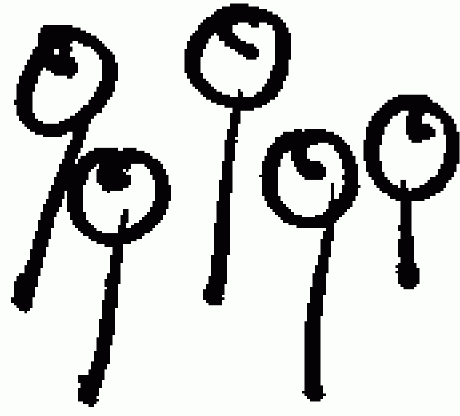
তৃতীয় যে গল্পটি নাটোরবাসীর কপোলকল্পনা থেকে জাত হয়েছে, তাতে আছে রানি ভবানীর রাজবাড়ির সংশ্লিষ্টতা। ওই রাজবাড়িতে রানির আমলে আর তাঁর পরবর্তী বংশধরদের সময়েও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পদার্পণ ঘটেছিল। আপনিও এসেছিলেন কোনো এক সময়ে রাজ-অতিথি হয়ে। দু দিন আপনি ছিলেন সেখানে। আপনার দেখভাল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল রাজন্য অমাত্য আর দাসীরা। তেমনই এক দাসীর সেবাযত্নে আর ব্যবহারে মুগ্ধ হন আপনি। গভীর মমতা জাগে আপনার কবিহৃদয়ে। আপনি তাকে নিয়ে

একটা কবিতা লিখবেন, বলেন তাকে। নারীটি লোকলজ্জার ভয়ে অধোবদন হয়ে বলে, আপনি যেন তার নাম ব্যবহার না করেন। আপনি কথা রাখেন। কল্পিত নাম বনলতা আপনার মনপবনের ঢেউয়ে পাল তুলে আসে, একদিন আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় সেই জগদ্বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিমালা—হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে...

কবি জীবনানন্দ! আপনার কৌতুকবোধের প্রতি আস্থা আছে বলেই এই কল্পকাহিনীগুলো আপনাকে শোনানোর সাহস অর্জন করলাম। আপনি ধূর্জ্জটিবাবুকে ওই ওপরে উল্লিখিত চিঠিতেই লিখেছিলেন, "আপনার মতামতের মূল্য অমূল্য নাও হতে পারে আপনি আমার কাছে নিবেদন ক'রেছেন,—কিন্তু তা যে অ-মূল্য মোটেই নয় সুধীসমাজই তা জানে। মতামত পাই আর না পাই চিঠির জবাব পাব ভরসা রাখচি,—ভবিষ্যতের letter বা memoirs-এর খোরাক যোগাড় করে রাখবার জন্য ঠিক নয়,—গুণীজনের সঙ্গে বরাবর একটা যোগাযোগ রেখে আনন্দ পাব বলে।"

৩ পৌষ, ১৩০৪-এ লেখা এই চিঠি। তখন আপনার বয়স ২৮-২৯। ধূর্জ্জটিবাবুর চিঠিটাকে আপনি ভেবেছিলেন ভবিষ্যতের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যতে তা প্রকাশযোগ্য হবে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কারণে, কিন্তু কালের কী কৌতুক দেখুন, চিঠিগুলো আজ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আপনার লেখা বলে, আপনাকে লেখা বলে।

না, আপনার চিঠিপত্র, গল্প-উপন্যাস, স্মৃতিকথা, আপনাকে নিয়ে লেখা অন্যদের লেখা—এসবের কোথাও এই মতের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না যে আপনি কোনো দিনও নাটোরে এসেছিলেন। কিন্তু নাটোরবাসী ভাবতে ভালোবাসে, আপনি তাদেরই একজন। নাটোরকে যে আপনি বিশিষ্টতা দান করে গেছেন! বনলতা সেন যে নাটোরের ছাড়া আর কোথাকারও নয়। আপনার এমনই খ্যাতি আজ, এমনই প্রতিপত্তি। কবিদের কবি আপনি, আধুনিক, অতি-আধুনিক, অস্পষ্ট, নির্জনতম, দুর্বোধ্য, পরাবাস্তব—কত বিশেষণ, অথচ আপনার কবিতার একটি চরিত্রকে নিজের করে পেতে নাটোরবাসী কতই না উদ্‌গ্রীব, মানুষের কী ভালোবাসাই না আজ আপনার জন্যে!



তখন গল্পের তরে...

এইবার, কবি জীবনানন্দ দাশ, স্নায়ুর ওপর কতটা ধকল সইতে পারেন আপনি, একটু পরীক্ষা হয়ে যাক। আপনি অনেক সময়ই বলেছেন, আপনার কবিতা নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, যে ব্যাখ্যা দান করা হচ্ছে, তার চৌদ্দ আনার প্রতি আপনার সায় নেই। কিন্তু সেসব আলোচনা তো প্রকাশিত হয়েছে। আজ আপনি নেই। আজকে আপনার কবিতার কোনো নতুনতর ব্যাখ্যা তো হতেই পারে।

আপনার সমীপে এখন সেই রকম একটা নতুন ব্যাখ্যা পেশ করব।

হ্যাঁ, আমরা কিন্তু কাব্যালোচনা করছি না, আমরা একটা উপন্যাস ফাঁদার পাঁয়তারা করছি, গভীর গভীরতরভাবে জাল ছড়াচ্ছি। আমাদের গল্পের নায়ক স্বয়ং আপনি, আর আপনার সঙ্গে আমাদের নায়িকার দেখাই হয়নি। আমরা সেই জায়গাটাই পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

ড. আকবর আলি খান পণ্ডিত মানুষ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর। বহির্দৃষ্টি প্রখর। অর্থনীতির পণ্ডিত মানুষ তিনি। তিনি তাঁর বহুবিখ্যাত *পরার্থপরতার অর্থনীতি* বইয়ে লিখেছেন, নাটোর একসময় তাঁর কর্মস্থল ছিল। নাটোরের প্রশাসকদের দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে তিনি দেখেছেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নাটোর কেবল কাঁচাগোল্লা ও জমিদারদের জন্যে বিখ্যাত ছিল না, বিখ্যাত ছিল উত্তরবঙ্গের রূপোপজীবিনীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হিসেবে। নাটোরের বনলতা সেন দিয়ে আপনি কেবল একটা স্থান বোঝাননি, মেয়েটির পেশার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।

এরপর কবিতাটা আগাগোড়া নতুনভাবে পড়া যায়, শব্দ ও চিত্রকল্পগুলোর নতুনতর ব্যাখ্যা তা থেকে উঠে আসে বৈকি। কেন তার কথা বলতে গিয়ে আপনি বারবার টেনে এনেছেন অন্ধকারের কথা, কেন সে শান্তি

দিয়েছিল মাত্র দু দণ্ডের জন্যে! পরিপ্রেক্ষিত বদলে গেলে অর্থ পাল্টে যায়। যাচ্ছেও। আকবর আলি খান বলছেন, "এখন আমরা বুঝতে পারি, বনলতা সেন কেন কবিকে দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিল, বুঝতে পারি, কেন কবির অভিসার 'নিশীথের অন্ধকারে' এবং 'দূর অন্ধকারে'। এই পটভূমিতে দেখতে গেলে 'এতদিন কোথায় ছিলেন' একটি সাধারণ প্রশ্ন নয়। বনলতা সেন যেন বলতে চাচ্ছে যে, সে ইচ্ছে করে রূপজীবার বৃত্তি গ্রহণ করেনি, তার জীবনে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা গেছে, সে দুঃসময়ে কেউ তার পাশে ছিল না। 'এতদিন কোথায় ছিলেন' একটি সৌজন্যমূলক প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে বিপর্যস্ত নারীর আর্তনাদ। বনলতার পরিচয় পেলেই আমরা বুঝতে পারি, কবি কেন কবিতার শেষে বলেছেন, 'সব পাখি ঘরে ফেরে'।"

পণ্ডিতদের কাজই এই—গবেষণা করা। সমালোচকের কাজই এই—লেখকের রচনার নতুনতর ব্যাখ্যা নতুনতর পাঠ হাজির করা। তাঁরা তা করতে পারেন। করেছেনও। আপনার মুখে সেই ম্লান হাসিটা ফুটে ওঠার কথা এখন, তা ফুটে উঠুক। কিংবা আপনি আমার চোখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে অট্টহাস্যেও ফেটে পড়তে পারেন।

কিন্তু আমি তো ফিকশন-লেখক। সত্যের দায় তো আমার নেই। আমার কাজ নায়কের সঙ্গে গল্পের নায়িকাকে মিলিয়ে দেয়া। আমরা তা-ই করব। এখন আমরা তাহলে আকবর আলি খানের *পরার্থপরতার অর্থনীতির* সূত্র ধরে এগোব।

আপনার হাঁটার বাতিক ছিল। রোজ বিকেলেই হাঁটতে বেরোতেন। এমনিভাবে আপনি একদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে বসেছিলেন একটা বেঞ্চে, কলকাতার লেকের ধারে নাকি বরিশালের কীর্তনখোলার তীরে, জাহাজঘাটা ধরে আলেকান্দা পাড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, বগুড়া রোড থেকে কালিবাড়ি রোড হয়ে, তখন সূর্য অস্তগামী, আকাশ কমলা হয়ে আছে, জলে তার ছায়া পড়েছে...

আপনি তখন আপনাতে আপনি বিলীন, আপনার মনে হচ্ছে আপনি হেঁটে এলেন বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ থেকে...

হঠাৎ প্রশ্ন, নারীকণ্ঠের, এতদিন কোথায় ছিলেন?

মালয় সাগর আর বিদর্ভ নগর থেকে স্বস্থানে ফিরে এলেন আপনি, কে কথা কয়।

তাকিয়ে দেখলেন, আপনার থেকে অনতিদূরে এক নারী, অস্তমিত

সূর্যের কনে দেখা আলোয় আপনার সামনে দেখতে পেলেন এক আশ্চর্য নারীমূর্তি, চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য...

অনেক দিন পর আজ আপনি এই পথে হাঁটছেন। মধ্যখানে কর্মব্যপদেশে অন্যত্র ছিলেন কত দিন।

'আমি যে কত দিন আসি নাই এই পথে, আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি তো রোজ সন্ধ্যায় এই জায়গাটাতেই দাঁড়াই। আপনি হেঁটে হেঁটে চলে যান, আপনার চলে যাওয়া দেখি। মাঝখানে কয়েক দিন আপনি নেই, খুব একটা ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম...'

'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।' বেঞ্চের একদিকে সরে এসে আপনি বলেন।

নারীটি বসে। আপনি শুধান, 'আপনার নাম কী?'

'আমার নাম?' মেয়েটি হাসে। হলদে আলোয় সেই হাসিটাকে শালিখের ঠ্যাঙের মতো বিষণ্ণ দেখায়।

'আমার নাম বনলতা।'

'শুধু বনলতা?'

'বনলতা সেন।'

'বাড়ি?'

'নাটোর।'

'নাটোর?'

'হুঁ।'

'এত দূর থেকে এখানে?'

'আমাদের ওখানে খুব অভাব। অভাবে স্বভাব নষ্ট।' মেয়েটি হাসার চেষ্টা করে, কিন্তু তার হাসি থেকে কেবলই বিষাদ ঝরে পড়ে।

আপনি, কবি জীবনানন্দ দাশ, ঘুরে মেয়েটির মুখের দিকে তাকান। মেয়েটি এবার আপনার মুখোমুখি।

এত সুন্দর মুখ আপনি যেন আর কখনো দেখেননি। এমন মায়াভরে কথা বলতেও কখনো যেন শোনেননি। অনেক দিন হাঁটার পর পিপাসার্ত পথিক জল পেলে যেমন শান্তি পায়, তেমনি এক শান্তি, যেন একটুখানি গৃহছায়ায় শরীর জুড়ানোর শান্তির স্পর্শ এই কণ্ঠস্বরে। মেয়েটি শুধাল, এতদিন কোথায় ছিলেন!

সমস্ত দিনের শেষে সেদিনও শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নেমেছিল, ডানা থেকে, দূরবর্তী ভবনের শীর্ষ থেকে, গাছগাছালির চূড়া থেকে রোদের গন্ধ মুছে নিয়েছিল চিল, পৃথিবীর সব রং মুছে যাচ্ছে, এই সময়টায় জোনাকির রঙে ঝিলমিল গল্পে-কথায় ভরে উঠবার কথা পাণ্ডুলিপির...

সব পাখি ঘরে ফিরছে, সব নদী ফিরে যাচ্ছে কুলায়, সাগরে, ফুরিয়ে যাচ্ছে জীবনের সব লেনদেন...

অন্ধকার আর অন্ধকার।

আপনার মুখোমুখি বসে আছে বনলতা সেন।

কবি, আপনি কি হাসছেন? আপনার কি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল? 'বনলতা সেন' আপনার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা, আর এটি প্রকাশিত হওয়ার পরও দেড় যুগ বেঁচেছিলেন আপনি, এই প্রশ্ন আপনাকে নিশ্চয়ই একাধিকবার শুনতে হয়েছে যে কে এই বনলতা? *বনলতা সেন* বইটি হাতে নিয়ে একই প্রশ্ন করেছিলেন *ভারতবর্ষ* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক গোপালচন্দ্র রায়, যিনি আপনাকে শেষজীবনে জুটিয়ে দিয়েছিলেন আপনার জীবনের সবচেয়ে ভালো চাকরিটা, তাঁরই উদ্যোগে ও সুপারিশে হাওড়া কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে আপনি জীবনের শেষ বছরটি কাটিয়েছেন। গোপালচন্দ্র রায় একদিন সকালবেলা গেছেন আপনার বাড়িতে। আপনি তাঁকে বসালেন আপনার অনাড়ম্বর বৈঠকখানার কাঠের চেয়ারে। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত *বনলতা সেন* বইটি হাতে করে নিয়ে এলেন, বললেন, সিগনেট প্রেস বার করেছে। বইটা গোপালবাবুর হাতে দিয়ে আপনি বললেন, 'কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সবই ভালো, কিন্তু কভারের ছবি আমার আদৌ পছন্দ হয়নি।'

গোপালবাবু বইটা উল্টেপাল্টে দেখছেন। তখন আরেকটা *বনলতা সেন* বই হাতে তুলে নিয়ে আপনি গোপালবাবুর নাম লিখে সেটা তাঁকে দিলেন উপহার হিসেবে। গোপালবাবু হেসে আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা, আপনি যে লিখেছেন নাটোরের বনলতা সেন, এই বনলতা সেনটা কে? এই নামে সত্যি আপনার পরিচিতা কেউ ছিল নাকি?' আপনি যথারীতি আপনার মিটিমিটি হাসিটা হেসেছিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দেননি। আপনার ভাগ্য ভালো ছিল কবি, আপনার সময়ে টেলিভিশনের বেসরকারি চ্যানেলগুলো ছিল না, থাকলে টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা ওই প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে ঠিকই বের করে নিয়ে ছাড়ত।



হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে

হাজার বছর ধরেই যেন আপনি হাঁটছেন। রোজ হাঁটতেন আপনি। সেই শৈশব থেকেই হাঁটা ছিল আপনার নেশা। খুব ছোটবেলায় আপনার কী এক মারাত্মক অসুখ হয়েছিল। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন সকলের। মা আর আপনার দাদামশাই আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন যত স্বাস্থ্যনিবাসে, বিভিন্ন জলবায়ুর জনপদে: লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি। আপনাদের অবস্থা এমন কিছু সচ্ছল ছিল না। আপনার মা কুসুমকুমারী দেবীকে বাড়ির অন্য সদস্যরা নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করল, বলল, এই পাগলামো বন্ধ করো। কিন্তু কুসুমকুমারী দেবী তো সেই মানা শোনার পাত্রীটি নন। ছেলে আরোগ্য লাভ করার পর তিনি বাড়ি ফিরলেন।

একবার আপনারা গিয়েছিলেন নেপালের কাছে, সুপোলে। তখন আপনার বয়স কত, ছয় কি সাত। রোজ সকাল-সন্ধ্যা ছোট ভাই অশোকানন্দ দাশকে সঙ্গে নিয়ে আপনি হাঁটতেন। আপনার ছোট ভাই আপনার পিছে পড়ে গিয়ে সেই পাহাড়ি পথে আকুল হয়ে ডাকত, দাদা, দাদা। মা ডাকতেন, মিলু, মিলু। একদিন আকাশে মেঘের ভেলা দেখে অশোককে বললেন, 'ভেবুল, জানিস, বড় হয়ে আমি এমন একটা নৌকা তৈরি করব, সেটা ওই আকাশ দিয়ে মেঘের পাশে পাশে ভাসবে, তুই আর আমি মেঘের পাশ দিয়ে নৌকা বেয়ে বেয়ে চলে যাব।' বগুড়া রোডের বাড়িটি থেকে বেরিয়ে আপনি, আপনার সুদূর শৈশব থেকেই অনেক হেঁটেছেন, বরিশালের পথে পথে, শ্মশানভূমির পাশ দিয়ে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছেন লাশকাটা ঘরটাকে। বড় অযত্নে পড়ে থাকত ওই লাশকাটা ঘরটা। হেঁটে চলে যেতেন কীর্তনখোলার তীরে, তাকিয়ে দেখতেন

স্টিমারের যাওয়া-আসা। কখনো সন্ধ্যার পর আলো জ্বলত দূরবর্তী জেলেনৌকায়, একটু আশার মতো, মানুষের একটুখানি অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে, আপনি মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকতেন।

বরিশাল ছিল এক অপূর্ব স্থান। চারদিকে গাছ, মাথার ওপরে গাছ, চোখের সমুখে গাছ, পায়ের নিচে পাতার স্তূপ, জাম, বট, কাঁঠালের, হিজলের, অশথের—আপনি হাঁটছেন তো হাঁটছেনই, নাটাফল আর ধুন্দলের বীজ খুঁটছে পাখিরা, শালিখ, খঞ্জনা, গঙ্গাফড়িঙের বুকের রঙের মতো ঘাসের নরম আদর পায়ে মেখে; কাচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকাদের অশ্রুতপূর্ব গুঞ্জনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতেন আপনি; পুকুরের পাড়ে হাঁসদের, বালিকার, রাঙা পায়ে ঘুঙুরবাঁধা, পুকুরে চাল ধুচ্ছে কিশোরী, তার চালধোয়া শাদা হাত—আপনি হাঁটতেন, আকন্দ বাসকলতাঘেরা নীল মঠটা পেরিয়ে, ফণিমনসার ঝোপ আর শটিবন পাশ কাটিয়ে আপনি হেঁটেই যেতেন।

তিন পুরুষের ব্রাহ্মবাড়িটা একান্নবর্তী, আপনার ঘরটা ছিল বিশেষ রকমের অপরূপ। ঘরের চাল ছিল গোলপাতার, আপনি এই রকম একটা ঘরেই থাকতে চেয়েছিলেন বলে। উঠোনে কৃষ্ণচূড়া, কী সবুজ তার চিকন পাতাগুলো, বাতাসে কেমন তিরতির করে কাঁপত। তার ফুল কমলা, লাল। লাল আর সবুজে এক অপূর্ব আলপনা যেন আঁকা। তার নিচেই ঘন সবুজ ঘাসের মোলায়েম গালিচা। আপনার জানালার পাশেই দুটো গন্ধরাজ, তার কালচে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে গন্ধরাজ ফুলের অপরিসীম শুভ্রতা। গন্ধরাজের সৌরভে পুরো বাড়িটা যেন নেশা-ধরানো আমেজে বুঁদ। নীল রঙের জবার গাছ ছিল, ময়ূরীর পেখমের মতো সে ফুলের রং। বেড়া বেয়ে মাধবীলতার ঝাড়, সবুজে লালে কী তার গরিমা!

কুয়াশামাখা ভোর নামত, পবিত্রতার মতো। সেই ভোরবেলাকার নীরবতা ভঙ্গ করে ভেসে আসত আপনার পিতা সত্যানন্দ দাশের ভক্তিপূর্ণ গলায় উপনিষদের শ্লোক :

ঋধক্ সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবা
কবে। পবস্ব সূর্য্যো দেশে॥
অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে।
অবাবশন্ত ধীতয়ঃ।

হে কবি, হে সৌম্য, তুমি দীপ্র-প্রজ্ঞা-তেজে
অগ্রসরমাণ হও দূর-দূরান্তরে
কল্যাণ-স্বস্তির জন্যে, সূর্যের মতন
দেখাতে সত্যের মুখ, সত্যের আলো॥

তার পরপরই ভোরের মিহি বাতাসে ভেসে ভেসে আসত আপনার মা, কুসুমকুমারী দেবীর কণ্ঠের গান :

'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে
তোমার বিশ্বের সভাতে।
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে
উদয়গিরি হতে উচ্চে লহো মোরে
তিমির লয় হল দীপ্তি সাগরে,
স্বার্থ হতে জাগো দৈন্য হতে জাগো,
সব জড়তা হতে জাগোরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে।'

আপনারা জাগতেন। উদয়গিরির চেয়েও উঁচুতে উঠবেন একদিন, তখন সে কথা জানা ছিল না, তবুও জাগতেন। পুরো বাড়ি জেগে উঠত। একান্নবর্তী পরিবারের জেঠা-জেঠি, কাকা-কাকি, খুড়ো, পিসি, জেঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা, পরিচারক-পরিচারিকারা। শীতের সকালে রান্নাঘরের চুলা জ্বলছে, মোরগফুলের মতো তার শিখা, তারই চারপাশে গোল হয়ে আছেন আপনারা, ভাইবোনে মিলে, উত্তপ্ত তাওয়ায় সেঁকা হচ্ছে গোল রুটি, তার আটাপোড়া গন্ধে তাতানো শীতের রোদ, রুটি আর গুড়ের প্রাতরাশ যেন অমৃত।

তারপর মায়ের কাছেই পড়া। আপনাদের বাবা সত্যানন্দ দাশ, বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, কেবল শিক্ষকই নন, বরিশাল ব্রাহ্মসভার আচার্য, সাধকের মতো তাঁর জীবনাচরণ আর চেহারা। কিন্তু অধ্যয়ন করতেন পশ্চিমের আধুনিক দার্শনিকদেরও, এমনকি আধুনিক রাশিয়ার নবচিন্তাও। আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ, এলিজাবেথীয়

সাহিত্য থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য—তাঁর অভিনিবেশ ও পাঠের তালিকা ছিল বিচিত্র ও বিপরীত-দিগন্তস্পর্শী। আপনাদের বাবা চাননি অতিশৈশবেই আপনাদের স্কুলজীবন শুরু হোক। কাজেই লেখাপড়া শুরু হয়েছিল মায়ের হাতেই। কুসুমকুমারীকে এখন এক আশ্চর্য প্রতিভা বলেই মান্য করব আমরা। লেখাপড়া বেশি দূর করতে পারেননি তিনি, বরিশালের এই মেয়ে পড়েছিলেন চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত, পরে কলকাতার বেথুন স্কুলে সম্ভবত সর্বোচ্চ ক্লাস পর্যন্ত উঠেছিলেন। ১৯ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তাঁর, এত বড় সংসারে এসে চারদিকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার একটা আবহ দেখেছিলেন—এই বাড়ির নারীরাও উচ্চশিক্ষিত, এমনকি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও আছেন এই বাড়িতে, আপনার পিসিমা, আর আপনাদের বাড়িটাও ছিল, সর্বানন্দ ভবনটা, ওই মেয়েস্কুলের চত্বরের ভেতরই। কিন্তু কুসুমকুমারী দেবী সংসারের ভার কাঁধে তুলে নেওয়ার পর পড়াশোনা আর চালিয়ে যেতে পারেননি। খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে হতো তাঁকে, আর বিছানায় যেতে হতো সবার শেষে। একটামাত্র আটপৌরে শাড়িতে মলিন বেশে কাজের মধ্যে থাকতেন সারা দিন, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি একান্তে করে গেছেন তাঁর সাহিত্যসাধনা। আপনিই লিখেছেন আপনার মায়ের অবলীলায় কাব্যরচনার প্রতিভার কথা। ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার সম্পাদক মনোমোহন চক্রবর্তী এসে বললেন, 'এক্ষুনি পত্রিকার জন্যে তোমার কবিতা চাই, প্রেসের লোক দাঁড়িয়ে আছে।' আপনার মাও খাতা-কলম হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন, এক হাতে খুন্তি চলছে, আরেক হাতে চলছে কলম, কী অনায়াসেই না লিখে গেছেন সেই সব গদ্য-পদ্য! সদ্য-রচিত কবিতাখানা, যাতে এখনো লেখকের হাতের উষ্ণতা আর তরকারির হলুদ-তেল-বাষ্পের তাপ ও গন্ধ জড়ানো, সেটি নিয়ে হাসিমুখে ব্যস্ত পায়ে চলে যেতেন আচার্য চক্রবর্তী। সাহিত্য পড়ায় আর আলোচনায় মাকে বিশেষভাবে অংশ নিতে দেখেছেন আপনি। দেশি-বিদেশি অনেক কবি আর ঔপন্যাসিকের কোথায় কী ভালো, এসবের প্রথম পাঠ আপনার হয়েছে এই গ্রাম্য গৃহবধূটির কাছ থেকেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব পদাবলী থেকে তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর বিয়ের এক বছর পর কলকাতার ব্রাহ্মরা একটা ছোটদের কাগজ বের করেন, *মুকুল* ছিল সেই পত্রিকার নাম, তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পাশে আরেক মফস্বল গৃহবধূর কবিতা বেরোতে শুরু করে, মাত্র কুড়ি বয়স

বয়সের কুসুমকুমারী লেখেন একটা, এখন বোঝা যাচ্ছে, কালজয়ী কিশোরপদ্য, 'আদর্শ ছেলে'—

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

সেই মায়ের কাছে প্রথম পাঠ সেরে আপনারা দুই ভাই, হয়তো তার সঙ্গে তুতো ভাইবোনেরা, ছুটলেন অবারিত সেই সেদিনের সবুজ-শ্যামল সজল বরিশালে। বগুড়া রোডের বাড়িটা তত দিনে হয়ে গেছে। তার আগে আপনাদের ঠাকুরদা সর্বানন্দ বাড়ি করেছিলেন রাজার বাসার পূর্ব দিকে, আর বিক্রমপুরের ভুঁইয়ার বাসার দক্ষিণ দিকে, আলেকান্দায়। এই বাড়িতেই জন্ম হয়েছিল আপনার। সেখান থেকে আপনার অতিশৈশবেই আপনার বাবা-মা জেঠা-কাকারা সবাই চলে আসেন বগুড়া রোডের সর্বানন্দ ভবনে। পাঁচ-ছয় বিঘা জমির ওপর ছিল সেই বাড়ি, মাটিলগ্ন। হোগলার বেড়া, গোলপাতার ছাউনি, বাঁশমাটির বেড়া। ছোট-বড় কয়েকটা ঘর। আধাশহর, আধাগ্রাম। আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিপুলসংখ্যক খ্রিষ্টান, আর মুসলিম ঘরবসতি। নারকেল-সুপুরি-আম-জাম-কাঁঠালের, হিজলের, তমালের বিস্তার। আর ঘাস। আর ঘাস। আর আকাশ। আকাশ ছড়িয়ে ছিল নীল হয়ে আকাশে আকাশে।

মিলু আর ভেবুল—দুই ভাই হাঁটতেন আপনারা। কখনো বা শহর ছাড়িয়ে আরও দূরে, গ্রামে—যেখানে কার্তিকের মাঠে শিশির, যেখানে সোনালি খড়ের স্তূপ মাঠে মাঠে, যেখানে খয়েরি শালিখ হলদে লম্বা ঠ্যাঙে লাফাচ্ছে। বর্ষাবিস্ফারিত নদী এসে ঢেকে দিচ্ছে পথ। শীতে ওই নদী রোগা মেয়েটির হাতের মতো চিকন হয়ে সরে যাচ্ছে দূরে। গিরিডিতে হেঁটেছেন উশ্রী নদী পার হয়ে, বালুকাবেলায়, আমলকী-বনে। কখনো বা হেঁটে হেঁটে চলে গেছেন ক্রিশ্চান হিলের দিকে। কলকাতা ময়দানে, পার্কে, রাজপথে, অলিগলিতে, হেঁটেছেন ভোরবেলা, বিকেলে। তপ্ত দুপুরেও আপনি হেঁটেছেন বহুদিন। ছাত্রাবস্থায়, আর বেকারজীবনে চাকরি খোঁজার নাম করে। হেঁটেছেন সঙ্গী নিয়ে, অথবা সঙ্গীবিহীন। হেঁটেছেন পুনা শহরে, পার্বতী মন্দিরের চূড়ায়, যারবেদায় ভাঙা কুঁড়েঘরের পাশ দিয়ে, মুলামুথা নদীর সংগমে, কার্কিতে, লোনা ডোলার পথে পথে। হেঁটেছেন বোম্বাই শহরের পথেঘাটে, মালাবার হিলে, ওয়ালির সমুদ্র পাশে রেখে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস

থেকে বান্দ্রা, সান্টাক্রুজে, জুহুর সমুদ্রবেলায়। দিল্লির সড়কে সড়কে, লেন বাই লেনে, শাহি মহল আর মিনার আর মসজিদের ভিড়ে, লোড়ি গার্ডেনে, ইউসুফ সরাইতে মেহরৌলির পথে। হেঁটেছেন ঢাকার পুরানা পল্টনে, তখনো পুরানা পল্টনে ধানক্ষেত, বুদ্ধদেব বসু আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছেন বা আপনি তাঁকে, হেঁটেছেন কলকাতার ল্যান্সডাউনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কে, ময়দানে, কখনো বা আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর। শেষ দিকে আপনার সঙ্গে হাঁটতেন লেখক সুবোধ রায়। হাঁটতে গিয়ে কখনো কখনো সুবোধ রায় আপনার সঙ্গে পেরে উঠতেন না, গতি শ্লথ করতেন, আর অমনি আপনি ভর্ৎসনার স্বরে বলতেন, 'খাড়ান কিয়া?' 'এ আবার কোন্ দেশী ভাষা?' সুবোধ রায়ের জিজ্ঞাসার জবাবে বলতেন, 'বরিশালের।' আপনার যেদিন ট্রাম দুর্ঘটনা হলো, সেদিনও তো আপনি হাঁটছিলেনই, ওই হাঁটতে গিয়েই অন্যমনস্কতায় আপনি পড়ে গেলেন চলন্ত ট্রামের সামনে...

প্রিয় জীবনানন্দ দাশ, আপনার প্রেমেরই গল্পটা আজ বলতে বসেছি। এই যাকে বলছি উপন্যাস, বলছি, আপনার সঙ্গে বনলতা সেনের প্রেমের গল্পটা বলার জন্যে এই আয়োজন, সেটা বলতে গিয়ে অন্যতর প্রসঙ্গ এসে গেলে, বুদ্ধিমান কবি, আপনিই বলুন, আমাদের প্রেমকাহিনী-পড়তে-ভালোবাসা পাঠক বিরক্ত হবেন কি না। হলে তাদের দোষ দেয়া যাবে না বটে। কিন্তু বনলতা সেনের গল্পই তো বলছি আসলে।

বনলতা সেন কবিতাটার কথাই তো সব। বলছি, হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি কথাটা যে লিখেছিলেন আপনি, সে তো এমনি এমনি নয়। সে কথা বলতে গিয়েই এত বায়নাক্কা। তারপর তো আছে সেই আসল প্রশ্নটা—এতদিন কোথায় ছিলেন?

এতদিন কোথায় ছিলেন, বনলতা সেনের সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার মুহূর্তটার আগে আপনি কোথায় ছিলেন, কীভাবে ছিলেন, সেই সব কথাও তো আসে ওই বনলতা প্রসঙ্গেই।



এতদিন কোথায় ছিলেন

বনলতা সেন আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এতদিন কোথায় ছিলেন। সেই প্রশ্নের মোকাবিলা আপনি কীভাবে করেছিলেন? কী দিয়েছিলেন ফয়সালা? কবিতার পাঠককে তা না জানালেও চলে, গল্পের পাঠককে জানাতেই হয়। বনলতা সেন কে, কোথায় তার সঙ্গে আপনার দেখা হলো, সেটা খোলাসা করতে গেলেও 'এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি' সেই ঘাটটা আমাদের পেরোতে হবে।

আমার কেন যেন মনে হয় জানেন, মনিয়ার কথাটাও একবার আমাদের পাড়তে হবে। কারণ বনলতার কথা লেখার আগে আপনি যে মনিয়ার কথা লিখেছিলেন। একবার নয়, একাধিকবার। মনিয়ার মৃত্যুটাই কি আপনাকে বেশি যন্ত্রণা দিয়েছিল, জীবনানন্দ দাশ?

আবার মনিয়ার কথা বলতে গেলেও যে বরিশালের কথা একটু বলে নিতে হয়।

বাড়িভরা লোকজন। আপনার মা আর জেঠিমা ঘরকন্না নিয়ে সদাব্যস্ত। এতগুলো লোকের খাওয়া-পরা। রান্নাবান্না ঘরদোর সামলানো। অসচ্ছল পরিবার। ঘরদোরের অবয়বেও তার চিহ্ন। কিন্তু কোথাও কোনো মলিনতার ছাপ নেই। নিকোনো ঝকঝকে উঠোন। ঘাস যেখানে বড় যত্নে বেড়ে ওঠা। বাগান যেখানে পরিকল্পিত আর মমতাময় হাতের নিগূঢ় যত্নে লালিত।

কুসুমকুমারী সারা দিনও সময় পান না আপনাদের কাছে আসবার। অতি ভোরবেলা দিন শুরু হতো তাঁর। শুধু নিজের একান্ত সংসারটি নয়, একান্নবর্তী অনেক বড় পরিবার আর তার নিত্যদিন লেগে থাকা শত অতিথির ভিড়কে চমৎকার গৃহিণীপনায় আন্তরিকতায় ভরণপোষণ ও আপ্যায়িত করার

সাধনায়।

আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে সেই শীতের রাতগুলোর কথা, যখন ছিলেন খুবই ছোট, সন্ধ্যার পরপরই অন্ধকার আর শীত ঘন হয়ে আসত সর্বানন্দ ভবনে, আপনার পড়া শেষ করে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনাদের জাগিয়ে তুলতে আসত মোতির মা। এসে বলত, ওঠো বাবারা, খাইতে হইবে, ওঠো।

আপনাদের ক্লান্ত শিশুশরীর জাগতে চাইত না। তখন মোতির মা ঘুষ সাধতেন। ওঠো বাবারা, তোমাগো পরন-কথা শুনামু নে।

মোতির মায়ের সেই পরন-কথার লোভে আপনারা উঠে পড়তেন। যেতেন রান্নাঘরে। মাটির মেঝেতে কাঁঠালকাঠের পিঁড়ির ওপর বসতেন সবাই মিলে মোতির মাকে ঘিরে। পিলসুজের ওপর প্রদীপ সাধ্যমতো আলো ছড়াচ্ছে। সেই আলো-আঁধারির ভেতর বসে চাষির মেয়ে মোতির মা রূপকথার গল্পের অপার রাজ্যের দুয়ার দিতেন খুলে। প্রদীপের ম্লান আলোয় মোতির মার চোখ বড় হচ্ছে ছোট হচ্ছে, নাসিকা স্ফারিত হচ্ছে, তিনি সমস্ত অবয়বটা দিয়ে গল্প বলে যাচ্ছেন। ডাইনির গল্প, ডালিমকুমারের গল্প, শঙ্খমালার গল্প, আবার মাঝে-মধ্যে গ্রামজীবনের সত্যিকারের গল্প। খাওয়া শেষে এসে শুয়ে পড়তেন আবারও।

আপনার ঋষিতুল্য বাবা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে অধ্যয়নরত। আপনারা শুয়ে পড়েছেন, ঠান্ডা বিছানায় দুই শিশুশরীরের উষ্ণতায় একসময় বিছানা গরম হয়ে উঠছে। কিন্তু মা আসছেন না। মা রান্নাঘরে তাঁর কর্তব্য করে চলেছেন। অতি কষ্টে আপনারা চোখের পাতাকে জোড় বাঁধা থেকে বিরত রাখতে চাইছেন। মা আসুক, তার আগে ঘুমাবেন না। চারদিক স্তব্ধ হয়ে আসতে চাইছে, রাত বেড়ে ঝিঁঝির ডাক প্রগাঢ়তর করে তুলছে। প্রহরে প্রহরে জেগে ওঠা বরিশালের নিশুতি রাতের সেই বাজকুড়ুল পাখিটা ডেকে ডেকে সময় জানাচ্ছে। আর কয় প্রহর জেগে থাকতে হবে মা, কখন তুমি আসবে?

একসময় মা আসতেন। 'এই, তোমরা এখনো জেগে?' দূরবর্তী পাখির ডাকের সঙ্গে মিলে যায় মায়ের কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ মা।'

'পড়াশোনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ মা।'

'কী পড়েছ?'

আপনারা বিবৃত করতেন।

আপনার মা কেরোসিনের আলোয় সেলাই নিয়ে বা বই নিয়ে বসতেন। আপনারা লেপের নিচে নড়াচড়া করছেন।

'কিরে। মিলু, ভেবুল, কী হয়েছে তোদের?'

'মা, ভয় লাগছে।' আপনি বললেন।

'ভয়। কেন রে। আমি আছি না! কিসের ভয়? ভূতের?'

'না মা। ভয় হচ্ছে, এই বুঝি এখুনি কেউ আসবে। কারও কোনো বিপদ-আপদ। কারও বাচ্চার অসুখ। কেউ হয়তো এত রাতেও ফিরল না। কেউ মারা গেছে। কারও ছেলেপিলে হবে। তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে।'

'না যাবে না।'

'যায় না প্রায়ই?'

'মানুষের বিপদে তো যেতেই হবে, বাবা।'

'তুমি তো সারা রাত মাঝেমধ্যে আসো না। সেই দিন তো আসোইনি আর।'

'আজ আর যাব না কোথাও। ঘুমাও।'

কুসুমকুমারী সেলাই করে চলেছেন। তাঁর মুখে পিদিমের আলো। অনন্ত নির্ভরতার মতো দেখাচ্ছে মায়ের মুখ। অগাধ শান্তির আশ্বাসে ঘুমিয়ে পড়লেন আপনি আর আপনার ছোট ভাই—মিলু আর ভেবুল।

মোতির মার কাছে আপনারা শুনেছিলেন পরন-কথা, ঠাকুরমার কাছে বিক্রমপুরের সেই সব পুরোনো গৌরবগাথা, আর মোতির মার দুই ছেলে মতিলাল শুকলাল আপনাদের শিখিয়েছিল মাছধরার কৌশল। বাড়ির পাশের বাঁশবন থেকে তলতা বাঁশ কেটে ছিপ তৈরি হতো, তারপর মশার কামড় সহ্য করে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পুকুরের পাশে বসে ধরতেন পুঁটি-খলশে নানা পদের মাছ। আর মুনিরুদ্দি রাজমিস্ত্রি, যিনি ছিলেন মস্ত বড় শিকারি, তিনি শোনাতেন তাঁর শিকারের রোমহর্ষক সব গল্প। বুট পরে, কালো কোট গায়ে বন্দুক হাতে মুনিরুদ্দি আর তাঁর ভাই লাখুটিয়া কাশীপুর জঙ্গলের দিকে যেতেন বীরদর্পে, আপনাদের সাহসও হতো না তাঁর কাছে যাওয়ার তখন। ঠাকুরমাও শিকারের গল্প বলতেন। কাকা ছিলেন ডেপুটি কনজারভেটর অব

ফরেস্টস। অনেক শিকার করেছিলেন তিনি। আপনাদের বরিশালের বাড়ির দেয়ালে, যে ঘরে দেয়াল ছিল, কাকার শিকার করা হরিণের শিং, বনমহিষের শিং, বাঘের চামড়া ঝোলানো থাকত। আর ছিলেন আপনাদের বড় মামা। আপনাদের দুই ভাইকে নিয়ে যেতেন পুকুরে, পিঠে করে নিয়ে গিয়ে যেতেন জলের গভীরে, আপনাদের ভয় ভাঙানোর জন্যে। এইভাবে আপনাদের সাঁতার শেখাটা হয়ে গিয়েছিল। মামাবাড়িতে যখন যেতেন, রাতে খোলা আকাশের নিচে উঠোনে মাদুর পেতে আপনারা আকাশ দেখতেন আর মামার কাছে গল্প শুনতেন। মামা আপনাদের চিনিয়েছিলেন আকাশের তারা, গ্রহ-নক্ষত্র, সপ্তর্ষি, স্বাতী, নীহারিকা...মামা যখন আরও দূর-প্রত্যন্ত গ্রামে যেতেন নৌকায় করে, আপনারাও সঙ্গী হতেন তাঁর। কত নদী বরিশালে, জলসিড়ি, ধানসিড়ি, কীর্তনখোলা তো আছেই...আর গৃহপরিচারক আলী মাহমুদ আপনাদের শিখিয়েছিল সুপুরিগাছে ওঠা, দড়ির ফাঁস দু পায়ে বেঁধে কীভাবে সুপুরিগাছে উঠতে হয়, আর কীভাবে জোড়া নারকেল ধরে সাঁতার কাটতে হয় নিরিবিলি জলে...আর আপনাকে গাছের লতার নাম শিখিয়েছিলেন তিনি...

ফকির নামে একজন আসতেন, দীনতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি। গ্রামের দরিদ্র কৃষক, এটা ওটা ফাইফরমাশ খাটতেন। একদিন আপনার বাবা তাকে বললেন, 'বাগানে ঘাস বড় হয়ে গেছে বর্ষায়, সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে, ফকির, এই ঘাস পরিষ্কার করো তো।'

ফকির ঘাসে কাস্তে চালাচ্ছেন। আপনি, জীবনানন্দ, কাঁদতে লাগলেন। প্রথমে নীরব কান্না, শুধু দু চোখ থেকে এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করে গড়িয়ে পড়ছে জল, তারপর শুরু হলো ফোঁপানি। 'কী হলো, খোকাবাবু?' ফকির জিজ্ঞেস করেন। 'ঘাসগুলো কাটছ কেন? ওরা বুঝি ব্যথা পাচ্ছে না?' কান্নার দমকে আপনার গলা বিকৃত হয়ে আসে। আপনাকে সান্ত্বনা দিতেন ফকির, 'কিছু ভাববেন না খোকাবাবু, কয়েক দিনের মধ্যেই আবার সুন্দর কচি ঘাস হবে।' অনেক পরে কান্না থামলে আপনি ফকিরকে বলেছিলেন, 'ফকির হইয়ে এসেছ জীবনে, যাইবে তুমি ফকির হইয়ে।' মাঝে-মধ্যে গ্রামে বসত পালাগানের আসর, রাতভর চলত ভাসানের গান, লখিন্দরকে সাপে কেটেছে, মনসাপূজায় রাজি হয়নি বলে, লখিন্দরের লাশ নিয়ে ভেলায় ভাসান দিল বেহুলা, কোন কালিদহে, কোন গাঙুরের জলে ভেসে চলল

ভেলা, পড়ে রইল মধুকর ডিঙা তার, ইন্দ্রের সভায় পৌঁছে গেছে বেহুলা, ইন্দ্রকে নেচে-গেয়ে খুশি করতে হবে, আহা, নিজের স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এই পুরুষসভায় নাচতে হবে বাংলার এই মেয়েটিকে, বাংলার নদী-মাঠ ভাটফুল তার ঘুঙুরের সঙ্গে কাঁদছে, আপনার হৃদয়ও কেঁদে উঠছে ছিন্ন খঞ্জনার মতো।

বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ক্লাস ফাইভে। কিন্তু সিক্সে উঠতে না-উঠতেই বাবার অসুখ। আপনারা চললেন গিরিডিতে। মামাবাড়ি। সেখানেও আপনি আর ভেবুল হাঁটছেন। দেখছেন নতুন নতুন জায়গা। ফিরে এসে আবার পড়াশোনা। কেবল পড়ার বই নয়, বাইরের বই। বাড়িতে বই ছিল, লাইব্রেরিতে বই ছিল। এর পরও নতুন বই, পত্রিকা খুঁজতেন। কিনতেন।

আর আপনাদের ঠাকমা গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে দিতেন আচার-আমসত্ত্ব এই সব। প্রহরী রাখতেন আপনাদেরই। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে তবে রক্ষা। আপনি ভেবুলকে শিখিয়ে দিতেন আচার কমে যাওয়ার কারণ ঠাকমা যখন জানতে চাইবেন, তখন কী বলতে হবে।

ঠাকমা ঠিকই দেখলেন, আচার কমে গেছে। আমসত্ত্ব সংখ্যায় কম।

'এই, এইগুলান কমল কেন রে?'

'ঠাকমা, বৃষ্টি আইছিল তো, তাই কমিয়া গেছে।'

ঠাকুরমা হাসতেন।

'এই আচারও দেহি কম? ঘটনা কী?'

'রোদে শুকায়া গেছে।'

ঠাকুরমা আরও জোরে হেসে উঠতেন।

তারপর একদিন বৃষ্টি আসার পর আপনি বসে গেলেন কবিতা রচনা করতে। সেটা রচিত হওয়ার পর পড়ালেন ভেবুলকে। ভেবুল সেটা মুখস্থ করে ফেলল।

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিশের দিকে এলোমেলো।
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছেলেদের খেলা মাঠে মুহূর্তেই সাঙ্গ হয়ে গেল!

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছিপ ফেলে বাথানের দিকে ওই চলে যায় কেলো!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
জল ধ'রে গেলে মাসি, তারপর কাঁথাগুলো মেলো!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
গেল গেল আমসত্ত্ব-পোড়োমুখো বৃষ্টি সব খেল!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
হরির মা কতগুলো ডাঁটো আম পেলো।

আপনার প্রথম দিককার এই পদ্যটা, আপনার জীবদ্দশায় কোথাও প্রকাশিত না হলেও এ কথা বলা আজ অনেক বেশি সহজ যে, আপনি লিখেছিলেন দারুণ। যোগ্য মায়ের যোগ্য ছেলের মতোই লিখেছিলেন আপনি।

পড়াশোনায় দারুণ ছিলেন আপনি। ক্লাসে ফার্স্ট হতেন। এই কথা লিখতে ইচ্ছা করছে না, কারণ আমাদের নাটকে-সিনেমায় এত ফার্স্ট বয় দেখেছি যে এটাও ব্যবহৃত ব্যবহৃত...কিন্তু সত্য বটে যে, আপনি ছিলেন ভালো ছাত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায় আপনাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। ক্লাসে সেকেন্ড হতেন আপনার বাল্যবন্ধু হরিজীবন ঘোষ। তার সঙ্গে পুরো ছাত্রজীবনব্যাপীই এক মধুর রেষারেষি ছিল এ নিয়ে। তবে এই রেষারেষিটা পড়াশোনার প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ ছিল, শত্রুতায় পর্যবসিত হয়নি কখনো। আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজেও পড়েছেন হরিজীবন, একসঙ্গে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাস করেছিলেন দুজনই।

সত্যানন্দবাবু, আপনার বাবা, প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজের বেতনটা পাওয়ার পরপরই আপনাদের নিয়ে যেতেন বইয়ের দোকানে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও ব্রাউনিংয়ের বই কিনলেন বাবা তো ছেলে কিনে ফেলল বায়রন, কিটস আর স্কুলে পুরস্কার হিসেবে পাওয়া গেল ওয়েলস কি রাসেল। বাবা আপনাকে আরও নানা ধরনের বই কিনে দিয়েছিলেন, হাক্সলি, স্পেনসার, ডিকেন্সের সম্পূর্ণ সেট। অনেক বন্ধুও নাকি ছিল আপনার। বাড়ির মাঠে ফুটবল খেলা হতো। ক্রিকেট খেলা হতো। সেসবে কি আপনি

যোগ দিতেন? দিলে ভালো করতেন? ভেবুল বলছে বটে, আপনিও খেলতেন, বন্ধুবান্ধব ছিল আপনারও, তবে একটু-আধটু খেলাধুলা করলেও মন যে আপনার সাহিত্যে মেতে ছিল, তাতে আর সন্দেহ কি! বন্ধুদের নিয়ে একটা ঘরোয়া সাহিত্যসভা গড়ে তুলেছিলেন স্কুলে থাকতেই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রামায়ণের নানা চরিত্র নিয়ে তর্কবিতর্ক করছেন আপনারা, মা এসে তাতে যোগ দিলে সভা জমজমাট হয়ে উঠল।

১২ বছর বয়সে কবিতা লিখেছিলেন–

ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ঐ যাইতেছে বহিয়া।
কত শত জীবজন্তু বক্ষেতে ধরিয়া।
স্রোতস্বিনী বহে ঐ কলকল রবে।
উতরিয়া কত দেশ সমুদ্রেতে যাবে।

বোঝা যাচ্ছে আপনার মায়ের কবিতার একটা ছাপ আপনার ওপর পড়েছে।

হ্যাঁ। ওই যে পূর্বপুরুষের ওপরে ভর করা পরী আপনার পিঠে বেঁধে দিয়েছে একজোড়া অদৃশ্য ডানা—আপনাকে কবিতা পেয়ে বসছে। আপনি নিজেরই মুদ্রাদোষে আলাদা হচ্ছেন। আপনি ভিড়ের বাইরে আসছেন। আপনার দ্বারা রচিত হতে শুরু করেছে কবিতা। আর কিশোর আপনার চোখে লাগছে নানা কিশোরী-বালিকার বিনুনি দোলানো চঞ্চল গতিভঙ্গি, চিবুকের নির্জনতা, চোখের ম্লানিমা।

স্কুলে কলেজে যখন আপনি, অন্য সব ছেলে যখন সাইকেল আর ক্রিকেট নিয়ে মত্ত, আপনি তখন আপনার পিঠে অনুভব করছেন পালকের উন্মেষ, আপনি চলে যেতে চাইছেন কবিতার রাজ্যে। ইংরেজি বাংলা নানা পদ্য রচনা করছেন আপনি। চাইছেন মেয়েরা সেই কবিতা পড়ুক, সেসবের মর্ম বুঝুক।

একটা চমৎকার নির্জন ছায়ামেদুর বাংলো। বাংলোর সঙ্গেই ক্রিকেট টেনিস হকি খেলার মাঠটা সুদূর দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে অনন্ত নীলিমার নীলে। মাঠের চারদিকে বকুল লিচু শাল ঝাউ কত কী গাছ। ওপারে খ্রিষ্টানদের কবরস্থান।

এইখানে গাছের নিচে স্কুলের মেয়েরা আড্ডা দেয়। এদেরই মধ্যে একজন আছে, যাকে আপনার পছন্দ। যে দুই বছর আগেও ভালোবাসবার যোগ্য ছিল না, এখন দুই বছরেই সে প্রজাপতির মতো সুন্দর হয়ে উঠেছে আর আজ সে এই মাঠের ধারে গাছের নিচে মেয়েদের দলের সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে এসেছে, সাইকেলগুলো সব কাত করে রাখা, আর মেয়েটির পরনে জামরঙা শাড়ি।

আপনি এই মেয়েটির নাম এখন দেবেন শোভনা।

কিন্তু আপনার শোভনা তো বরিশালে থাকে না, সে থাকে শিলংয়ে, পড়ে বোর্ডিং স্কুলে, এবং শিলংয়ের পাহাড়ি পথে সাইকেল নিয়ে খুব সুবিধা করার অবকাশ কম। এই শোভনা তো তাহলে ওই শোভনা নয়। কিংবা ওই শোভনার কথা ভাবতে ভাবতে বরিশালে পাড়ার কোনো আকর্ষণীয় কিশোরীকে দেখে তাকে নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে আপনি নায়িকার নাম উদ্দেশ্যমূলকভাবেই শোভনা দিয়েছেন। অথবা এমনও হতে পারে, ছুটি-ছাটায় শোভনা বরিশালে পিতামহের বাড়িতে বেড়াতে আসত, থাকত মাসাধিককাল, তখন অন্য সব সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে সেও খেলতে বেরুত, হয়তো বেরুত সাইকেল নিয়েও। এই ঘটনা সেই সময়কার।

আজ এখানে ভিড় দেখে আপনার মনটা একটু দমে গেল। আপনি চাইছিলেন যেকোনো ছুতোয় ছেলের দঙ্গলের বাইরে আজ শোভনা একটু আলাদা থাকুক।

কী সুন্দর স্কুলের ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে, সাইকেল চালাচ্ছে, আর আপনাকেও তারা আহ্বান করছে সাইকেল চালাতে, কিন্তু আপনি সাইকেল চালানো শিখবেন না, ক্রিকেট খেলতে নামবেন বটে, পরনে একটা ঢোলা পাজামা আর গায়ে একটা সাদা হাওয়াই শার্ট, নাকের নিচে সামান্য গোঁফের রেখা, ছোট করে ছাঁটা একটু শক্ত কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল, আর পাথর ঠিকরে ভেঙে ফেলবে এই রকম শাণিত দৃষ্টিরশ্মিভরা একজোড়া অপার্থিবতাময় চোখ, গায়ের রং শ্যামলাপনা, আপনার হাতে ব্যাট, ব্যাটটা ঠিক মানাচ্ছে না আপনাকে, তবু লিচুতলায় বসে থাকা শাড়ি পরা কিশোরীগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে আপনি ব্যাট ধরেছেন, প্রথম বলেই ক্যাচ তুলে দিয়ে আউট হয়ে যাবেন, তারপর মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসবেন মাঠ থেকে, মাঠের পাশে লিচুগাছের তলে সব কিশোরী, তারাও

সাইকেল চালায়, তারাও খেলা দেখছিল, তারা দেখল আপনি আউট হয়ে গেলেন, কিন্তু তারা কি জানে, অন্য সব ছেলের থেকে আপনি আলাদা? আপনি লিখতে জানেন কবিতা? একজন জ্যেষ্ঠতর কিশোর, তাকে আপনারা ডাকেন দাদা বলে, বলল আপনাকে, 'মিলু, তুমি সাইকেল চালানোটা শেখো না কেন?' শোভনা বলল, 'কে সাইকেল চালানো শেখে না, দাদা? মিলুদা?'

কিন্তু শোভনা কি জানে, আপনার সাইকেলের দরকার নেই, কারণ আপনার আছে অপার্থিব অদৃশ্য ডানা?

আপনার কবিতা আপনি দেখাতে চান তাকে, কিন্তু সে দেখে না, দেখতে চায় এই ভিড়ে দাঁড়ানো আরেকজন—রানী। আপনি অগত্যা তাকেই কবিতা দেন, পরের দিন, যখন ওদের বাড়ির সবাই গেছে একজন এনজিনিয়ারের বাড়ির বিয়ে খেতে। রানী আপনার কবিতাটা তার ব্লাউজের ভেতরে রেখে দেয়। তার বুকের কোমলতা আর উষ্ণতার কাছে। তবু, রানীকে আপনার ভালো লাগে না, আপনার ভালো লাগে শোভনাকে।

যে গল্পটাতে আমরা এই সব প্রসঙ্গ পাচ্ছি, তার নাম 'মহিষের শিং'।

হ্যাঁ, আমরা নারীর আভাস পাচ্ছি, আভাস পাচ্ছি ভালো-লাগা দীর্ঘশ্বাসের। সব কিশোরের জীবনেই যেটা ঘটে থাকে। আর কবিতায়-পেয়ে-বসা মানুষের জন্যে সেটা তো আরও বেশি স্বাভাবিক। কবিতার জন্যেই আপনার দরকার নারীসবিতা, কিংবা নারীর জন্য কবিতা।

আমরা আপনার সেসব দিনের খোঁজে হাত পাতব আপনারই বিভিন্ন লেখার কাছে। আর আপনার গল্প-উপন্যাসগুলো যেহেতু আপনার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, আমাদের কাছে অনেক সময় তা আপনারই জীবনচর্চার ও চর্যার অন্যতর উৎসার বলে মনে হয়। আর কবিতা তো সব সময়ই তা-ই। সে তো কবির হৃৎকথনই। কিন্তু স্কুল বা কলেজজীবনে আপনি সেইভাবে প্রেমে পড়েছেন, তার প্রমাণ কই? কারণ আপনার প্রথম বই *ঝরা পালক*-এর একটা কবিতাও তো কোনো নির্দিষ্ট নারীর জন্যে লেখা প্রেমের কবিতা নয়। 'মহিষের শিং' গল্পে পাওয়া যাবে আপনার স্কুলজীবনের কবিতা আর নারী-প্রসঙ্গ, কিন্তু সে তো রচিত হয়েছে আপনার তেত্রিশ বছর বয়সে।

তবে হ্যাঁ, বনলতা নামের এক কিশোরীর কথা আমরা পাব আপনার আরেকটা লেখায়—*কারুবাসনা* উপন্যাসে। বার বার বলব, *কারুবাসনা* উপন্যাসটা ঠিক যেন আপনার আত্মকথন। এর ঘটনা আপনার জীবনের

সঙ্গে এত মিলে যায় যে এটাকে আপনারই দিনলিপি বলে মনে হয়। কেদারবাবুর মেয়ে বনলতা। কেদারবাবু আবার এই গল্পের কথকের (আমাদের মনে হয় আপনার) বাবার বন্ধু।

উপন্যাসে এইভাবে চলে আসে বনলতার কথা–

কিশোরবেলায় যে-কালো মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—আজ, সেই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশের দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশে সেই যেন দিগ্‌বালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মণি, পূর্ব আকাশে আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কালো মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার—প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মত অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দু খানা হাত ম্লান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোন পল্লির দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশে তার যাত্রা।

সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝা-গড়নের মানুষ—শাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মতো দেখতে; বহুদিন হয় তিনিও পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানও নেই তাদের আজ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বঁইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই

আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নতমুখে মাঝপথে গেল থেমে, তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর তাকে আর আমি দেখিনি।

অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল; মনপবনের নৌকায় চড়ে নীলাম্বরী শাড়ি পরে চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে: মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দু খানা হাত, ম্লান ঠোঁট শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা— ।

১৯৩৩ সালে আপনি রচনা করেছিলেন *কারুবাসনা* উপন্যাসটি। তখন আপনার বয়স ৩৪। আপনি বলছেন বছর কুড়ি আগে বনলতা আপনাদের পাশের বাড়িতে থাকত। তার মানে আপনি আপনার ১৩/১৪ বছর বয়সের ভালো লাগার কথা বলছেন এখানে। ওই কৌশোরক ভালো লাগাকে আর যাই বলা যাক, প্রেম বলা যায় না! কিন্তু প্রথম ভালো লাগার স্মৃতি আসলে মানুষ ভোলে না। ভালোবাসা আসলে পুরোনো হয় না, পচে না, আর তা যদি প্রথম ভালোবাসা হয় তবে তো কথাই নেই। ওই গ্রাম্য কিশোরীর অম্লান মুখচ্ছবিটা আপনি হয়তো চিরটাকাল আপনার মধ্যে লালন করে গেছেন। তার নাম যে বনলতাই ছিল, এমন হয়তো নয়। হয়তো সে শচী, হয়তো সে মাধবী, হয়তো সে বিনতা। হয়তো সে মনিয়া। এই-ই হয় কবিদের। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'কবির সকলই আছে, একাগ্রতা নেই'। একজনকে সারা জীবন ধরে রাখবার, মনে রাখবার, অবলম্বন করবার সামর্থ্য নিয়ে কবিরা জন্মান না।

আপনার ডায়েরিতে বারবার এসেছে ওয়াই নামের এক মেয়ের কথা, এসেছে বিওয়াই, জিওয়াইয়ের কথা। আর আপনিই আপনার পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় লিখে রেখেছেন ওয়াই = শচী। তাহলে এক জায়গায় এসে আপনার শোভনা আর শচী একাকার হয়ে যাচ্ছে, জীবনানন্দবাবু। সেটা হওয়া খুবই সম্ভব। কারণ আপনি আসলে কোনো নারীর প্রেমে পড়েছিলেন, তা মনে হয় না, আপনি প্রেমের প্রেমে পড়েছিলেন, কবিতা লেখবার জন্যেই আপনার অধীত বিদ্যা আর জন্মগতভাবে আপনার রক্তের ভেতর বয়ে চলা রোমান্টিকতার প্ররোচনা আপনাকে বলছিল একজন নারী দরকার, আপনি

যার প্রেমে পড়বেন, যে আপনাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করবে বটে, বিনিময়ে আপনারই দ্বারা লিখিয়ে নেবে চমৎকার সব প্রেমের কবিতা, সেই নারীটি কে সেটা মুখ্য নয়, সে হবে আপনার সমস্ত রোমান্টিকতার উৎস। আপনার ডায়েরির পাতায় বিশ বছর আগে-পরেও একটা নারীর মতো নারী, প্রেমের মতো প্রেম পেলেন না বলেই তাই কত বার যে আপনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।

এখন আমরা আপনাকে অনুসরণ করি আপনার শিক্ষাজীবন ধরে।

ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন, ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএতেও তা-ই। শুধু অল্প বয়সে ম্যাট্রিক বলে আইএ পরীক্ষার জন্যে এক বছর অপেক্ষা করলেন। এরপর চলে আসেন কলকাতা। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সিতে। থাকেন অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে। ওই সময়ই *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায় প্রথম ছাপার অক্ষরে বেরোল আপনার কবিতা : বর্ষ-আবাহন। তখন আপনার বয়স কুড়ি বছর। বৈশাখ সংখ্যায় নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে লেখা ছিল সেটা।

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে,
দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠল জেগে
দিব্য পরশ পেয়ে,
নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া
ভুবন ভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ-হৃদয় চেয়ে।

আপনারা দুই ভাই তখন থাকেন কলকাতার অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেলে। ভেবুল হোস্টেল-রুমের মধ্যে। আর আপনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন পাশের বস্তির মতো ঘর, শুনছেন ট্রামের ঘড়ঘড়, আর ওই পাশের বস্তিঘরে বাটনাহলুদমাখা বিভারানী বোস, তার দুই হাতে শাদা শাঁখা, আর কিছু নয়, চুলে তেল পড়েনি, জট লেগেছে তাতে। আপনার কালি কেনার পয়সা নেই, কাগজেও টানাটানি, ওই মেয়েটির কাছে ধার নেওয়া বইয়ের মার্জিনে পেনসিলে আপনি গান-কবিতা লেখার মকশো করছেন, কবিতায়

ঘুরে ফিরে আসে চিলের কথা, মেয়েটি আপনার নাম দিয়েছে শকুনকবি। আর বিভা নিজে কাঠকয়লা দিয়ে ছবি আঁকে দেয়ালে, আপনি তাকে ডাকতেন অবন্তী-বিভা। তখন আপনার ভয়াবহ দারিদ্র্য চলছে, তখনো কলেজের চাকরি জোটেনি, ল পড়ার চেষ্টা করছেন, ছোট ভাইটিও থাকে হোস্টেলে, কিন্তু স্বপ্নে আপনি স্বপ্ন বুনে চলেন বিভাকে নিয়ে, ছ মাসের ভাড়া পড়ে আছে, ঘরের চাল বাড়ন্ত...কল্পনায় তবু ওই মেয়েটিকে নিয়ে জোড়া শঙ্খচিলের মতো ওড়া...

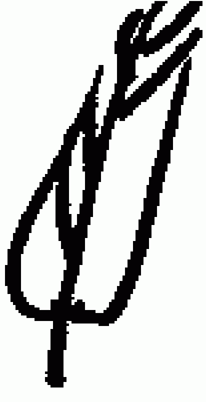
হঠাৎ সাইকেলে এক পথিককে দেখলেন, ঠিক যেন আপনার কলেজের রাশভারী দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধ্যাপক বোসের মতো দেখতে। আপনি ছুটে গেলেন ঘরে, ভেবুলকে ডাকতে, 'ভেবুল ভেবুল, জলদি আয়। তুই কল্পনা করতে পারিস, প্রফেসর বোস সাইকেলে চড়ে আমাদের গলি দিয়ে যাচ্ছেন!'

'না। হতেই পারে না।'

'আয়। দেখ।'

ভেবুল বেরয়। দেখে সে হাসতে হাসতে বাঁচে না। একটা লোক যাচ্ছে সাইকেলে, সে প্রফেসর বোসের মতো দেখতেও বটে, কিন্তু সে প্রফেসর বোস নয়...

আপনি হাসতে হাসতে যেন পড়ে যাবেন, বললেন, 'দেখলি, কী রকম হুবহু প্রফেসর বোসের মতো দেখতে তাকে...'



সেখানে ছিলাম আমি

আপনার কবিতা বেরোতে শুরু করেছে কলকাতার কাগজে। *কল্লোল*-এ, *কালি ও কলম*-এ। তত দিনে আপনি ইংরেজিতে এমএ পাস করেছেন। আইনেও ভর্তি হয়েছিলেন। সেটা অবশ্য পরে ছেড়ে দেন। ভালোই করেছেন। আইন পেশা আপনাকে দিয়ে হতো না। পরীক্ষার আগে আপনার ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি হয়েছিল, বড় ভুগেছিলেন আপনি। পরীক্ষা দিতে চাননি। কিন্তু বাবা চিঠি লিখে জানালেন, না, পরীক্ষা দেয়াই উচিত। তাই ভগ্নশরীরে পরীক্ষা দিলেন আর পাস করলেন, দ্বিতীয় বিভাগে পাস করলেন। এরই মধ্যে অক্সফোর্ড মিশন থেকে এসে উঠেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে।

এই সময় আপনার সামনে সরকারি চাকরির অবাধ সুযোগ। ম্যাট্রিক-আইএতে প্রথম বিভাগ, ইংরেজিতে মাস্টার্স, ১৯২১ সালে কলকাতায় আপনার চাকরিপ্রাপ্তি আর শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ঠেকায় কে!

কিন্তু আপনার ভেতর শিল্পের সংক্রমণ, কারুবাসনার বীজাণু। তার ওপর দেশের মানুষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। আপনার মাতুল পরিবারের সদস্য স্বদেশি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ। আপনি সরকারি চাকরি নিলেন না। আপনি যোগ দিলেন কলকাতার সিটি কলেজে, প্রথমে টিউটর হিসেবে।

ভেবুল এমএসসি পড়তে কলকাতায় এসেছে। দুজন ছোট্ট বাসা নিয়েছেন বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। এক রুমের বাসা। সেখানে বসেই লিখে চলেছেন কবিতা। এরও আগে অবশ্য লিখেছেন আপনি কবিতা, কিন্তু ইংরেজির ছাত্র বলেই হয়তো সেসব লিখেছেন ইংরেজিতে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণে লেখা আপনার কবিতা ছাপা হয়েছিল

বঙ্গবাণী পত্রিকায়। বড় হওয়ার পরে, যাকে কবির বড় হওয়া বলে, তারপর, আপনার প্রথম কবিতা ছাপা হলো কলকাতার কোনো কাগজে। আপনি ভীষণ উত্তেজিত। মনে মনে। কিন্তু বাইরে সেই উত্তেজনা দেখানোর লোক তো আপনি নন। নিজের কবিতাটা নিজেই কয়েকবার পড়লেন। মন্দ হয়নি, ভালো হয়েছে, নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে। না হলে ছাপা হবে কেন। আপনি সেই কবিতাটা দেখালেন ভেবুলকে। ভেবুল তার এমএসসির পড়া নিয়ে ব্যস্ত। পড়ল, নাকি চোখ বোলাল, বোঝা গেল না।

সে কিছু বলে না। মুখ ফুটে তো তাকে বলাও যায় না, কেমন হয়েছে, বল।

শেষে আপনি আগ্রহভরে পত্রিকাটা পাঠিয়ে দিলেন মাকে। কুসুমকুমারী ফিরতি ডাকেই জানালেন তাঁর প্রতিক্রিয়া। চিত্তরঞ্জনের ওপর লিখেছ তুমি, ভালোই করেছ, কিন্তু রামমোহনের ওপর লিখতে বলেছি তোমাকে, মহর্ষির ওপরও।

খানিকটা হতোদ্যম হলেন মার এই কথা শুনে। মা কি ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন?

দেশবন্ধু বরিশালে গিয়েছিলেন। তখনো তিনি দেশবন্ধু খেতাব পাননি। কিন্তু বরিশালে তিনি আগুন জ্বালিয়ে এসেছিলেন। পুরো পূর্ববঙ্গই তখন দেশবন্ধু-আন্দোলিত। সেই দেশবন্ধুকে নিয়ে কবিতা না লিখে এটা কি মহর্ষিকে নিয়ে, রামমোহনকে নিয়ে লেখার সময়?

শান্তি নেই, শান্তি নেই! কবিতা আপনাকে অস্থির করে মারছে। একটার পর একটা কবিতা আসছে। একদিন, মেসে বসেই আপনি লিখে ফেললেন 'নীলিমা'। পাঠিয়ে দিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ও আভাঁগার্দ পত্রিকা *কল্লোল*-এর ঠিকানায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তখন কাজ করেন *কল্লোল*-এ।

কবিতাটা পড়লেন তিনি। তাঁর কাছে মনে হলো, এ যেন এক টুকরো নীলিমা এসে উড়ে পড়ল *কল্লোল* অফিসে। লেখকের নাম কী? না, শ্রীজীবানন্দ দাশ।

কবিতাটা ছাপা হলো *কল্লোল*-এ। কিন্তু আপনার নামের বানান তারা ঠিক ছাপতে পারল না। জীবনানন্দ দাশ-এর বদলে ছাপা হলো শ্রীজীবানন্দ দাশ। দেখে আপনার মনটা খারাপ হলো বৈকি। নাম ভুল ছাপা হয়েছে, তা

হোক, নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন আপনি, তবুও তো কবিতাটা ছাপা হয়েছে! যদি কবিতা ভালো হয়ে থাকে, তাহলে কি কবির নামটাও একদিন সযত্নে ছাপা হবে না? কাগজে? মানুষের হৃদয়ে? মহাকালের খাতায়?

মহাকাল! আপনার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এসব কি আদৌ কবিতা?

এই সময় আপনার মেসের ঠিকানায় একটা পোস্টকার্ড এল। পত্রলেখক স্বয়ং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। *কল্লোল* পত্রিকার প্রধান এক স্তম্ভ। তিনি লিখেছেন, 'নীলিমা' কবিতাটা তাঁর ভালো লেগেছে।

ওই চিঠিটা পড়ে কী যে ভালো লাগল আপনার। মনটাই ভালো হয়ে গেল।

আপনি চিঠির জবাব লিখতে বসলেন।

18/2/A Bechu Chatterjee Street
Calcutta
22.2.26.

সবিনয় নিবেদন,

আজ আপনার কার্ডখানা পাইয়া বড়ই প্রীত হইলাম। আমার কবিতাটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, একজন যথার্থ সৌন্দর্যপূজারীর সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ ও অবকাশ পাইয়াছি বলিয়া। ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আপনার বাসর-রাত্রি কবিতাটি কি যে মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। এমনতর কথা আপনাকে জানাইবার ভরসা এত দিন আমার ছিল না। আজ আমার সে অধিকার জন্মাইয়াছে বলিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছি।

কল্লোল ও অন্যান্য পত্রিকায় আপনার লেখা কবিতা ও গল্প আমি অনেক দিন হইতেই পড়িয়া আসিতেছি। আপনার রচনার অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে আপনাকে সম্ভাষণ করিয়া আসিয়াছি।

চিঠির ভিতর দিয়া আজ আপনার সঙ্গে আমার সে পুরনো পরিচয় যে নূতনতর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, ভগবানের

নিকট কামনা করি তাহা যেন চির অটুট থাকে।
শীঘ্রই আপনার সহিত দেখা করিব। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ
নমস্কার গ্রহণ করিবেন।
ইতি আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

একদিন আপনার মেসে এসে হাজির অচিন্ত্যকুমার স্বয়ং। তাঁর কবিতা এত দিন আপনি পড়ে এসেছেন। *কল্লোল*-এর অন্যতম কর্তা অচিন্ত্য স্বয়ং।

অচিন্ত্য এলেন। আপনি, জীবনানন্দ দাশ, দরজা খুলে দিলেন। কেবল ওই ঘরখানির দরজা নয়, বন্ধুত্বের অমল দরজাও। আপনারা বন্ধু হয়ে গেলেন। আপনার তখন চাকরি আছে, মাসশেষে আছে নিশ্চিত রোজগার, অচিন্ত্য আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, আপনারা হাঁটেন চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে গড়ের মাঠে, তারপর ইন্ডোবর্মায় চপ-কাটলেট চা হয় একপশলা, আপনিই পয়সা দিয়েছেন। একা একা চলার অভ্যেস ছিল আপনার, হয়তো রেস্তোরাঁয় বসে আপনি খাবারের থালা নাড়ছেন, একটু দোহারা গড়ন ছিল আপনার, খাদ্যে রুচি ছিল সমূহ, হঠাৎই কোত্থেকে এসে পাশে বসেছেন অচিন্ত্য। ভাগ বসিয়েছেন আপনার পাতে। তাঁর রোমওয়ালা হাত অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপের মতো এসেছে বটে, কিন্তু বিনিময়ে যা পেয়েছে, তার নাম মমতা।

তিনি আপনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জীবনানন্দ, জীবনে তো একটা কিছু মানতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়, তুমি কী মানো?'

অচিন্ত্যের প্রত্যাশা ছিল, আপনি বলবেন, ঈশ্বর মানি। কিন্তু আপনি বললেন, 'মানুষের নীতিবোধ মানি।'

উনি বললেন, 'ওই একই কথা। মানুষের নীতিবোধও যা, ঈশ্বরও তা-ই।'

তাঁদের এই মোলাকাত রূপ পেল স্থায়ী বন্ধুত্বের।

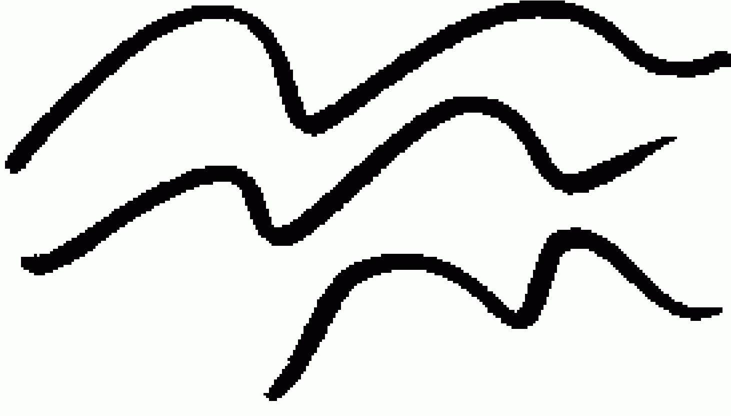
কলকাতাবাসী আপনি, মাঝেমধ্যে বরিশালে আসেন। প্রথমে ট্রেনে করে খুলনা, তারপর জাহাজে করে কীর্তনখোলার ঘাটে। আপনার সেই গোলপাতার ছাউনি দেয়া ঘরে ফিরে আসেন, পাখি যেভাবে কুলায় ফেরে। বরিশালই আপনার ভালো লাগে। মা, ছোট বোন খুকি, যার ভালো নাম

সুচরিতা দাশ, সেও এখন বালিকা।

বর্ষা চলে এসেছে। বৃষ্টিপ্রবণ বরিশালে তবু এ বছর বৃষ্টির দেখা নেই। চারদিকে সবুজ বনশ্রী। মাথার ওপর সফেদ মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না। আপনার মনে হচ্ছে, আপনি যেন মরুভূমির সবজিবাগের ভেতর বসে আছেন, দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। মনে হচ্ছে, আপনার তুরানি প্রিয়াকে যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, আপনার ভাবনার জগৎ, ভাবনা প্রকাশের ভঙ্গির ওপর নজরুল-মোহিতলালের প্রভাব। কিন্তু ওই যে তুরানি প্রিয়াকে হারানোর কথা বললেন, এটা চিঠিতে লিখলেনও অচিন্ত্যকুমারকে, সে কি কেবলই কাব্য করে? এই প্রিয়া কি কেবলই কাব্যের প্রিয়া? নিতান্ত বিরহের কবিতা বানিয়ে তোলার আয়োজনে একজন প্রিয়ার কল্পনা?

তাহলে এর কিছুদিন পরই আপনার যে প্রথম কাব্যগ্রন্থখানি বেরোবে, তার উৎসর্গপত্রে আপনি কেবল 'কল্যাণীয়াসু' লিখলেন কেন। ওই শূন্যস্থানে কার নাম বসবে, জীবনানন্দ দাশ?



তেমনি দেখেছি তারে

যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন তুমি আমার কাছে এসেছিলে। এখন তুমি কাকে পেয়ে গেলে। তাই আর আসছ না। তুমি চলে গেছ। আমি কেন দাঁড়িয়ে রয়েছি। একবার ভালোবেসে তুমি কি আবার সেই ভালোবাসা বাসতে পার না?

কাকে নিয়ে ভাবছেন আপনি এই সব, কবি?

১৩৩৪ সালে বেরোল আপনার কবিতার বই *ঝরা পালক*। উৎসর্গ করলেন এক কল্যাণীয়াকে। কে সে?

'১৩৩৩ সাল' নামের একটা কবিতা বেরোল আপনার, *প্রগতি* পত্রিকায়:

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার; তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে!
কত দেহ এল,—গেল,—হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব;—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে...

নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু যদি তোমার দুপায়ে
হারায়ে চলিতে পথ-চলার পিপাসা!—
একবার ভালোবেসে—যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি সেই
ভালোবাসা!

কিন্তু তুমি চলে গেছ, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে!
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু কেন আমার এ পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ-চলার পিপাসা!
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা!

চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
আমার এ-পথে,—কারণ তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।
জানি আমি,—আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
তারপর,—কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি!—তাই আস নাই
আমার এখানে তুমি আর!

বলা খুবই মুশকিল, কাকে নিয়ে আপনি লিখেছেন এই কবিতা? সত্যি কি কেউ আপনার কাছে তার শরীর নিয়ে এসেছিল? নাকি সবই আপনার কবিমনের কল্পনা? প্রেমের আর বিরহের কবিতা বানিয়ে তুলবার আকাশকুসুম আয়োজন?

কিন্তু উৎসর্গপত্রটা তো মিথ্যে নয়।

এখন আমরা জানি যে, *ঝরা পালক* কাব্যগ্রন্থটির কল্যাণীয়া আসলে বেবি। তার আসল নাম শোভনা দাশ, পরবর্তীকালে মজুমদার। শোভনা আপনার ফরেস্ট অফিসার কাকা অতুলানন্দ দাশের মেয়ে। শোভনারা তিন বোন। মেজটার নাম বুলু, সে আপনার ছোট বোন সুচরিতা দাশ ওরফে খুকুর ঘনিষ্ঠ। আর ছোট বোন বেবি অর্থাৎ কিনা শোভনা। আমরা বেবিকে ডাকব ভালো নাম শোভনা ধরে, আপনার ছোট বোন খুকুর সমবয়সীই সে ছিল প্রায়। কিন্তু কী অজ্ঞাত কারণে শোভনার চেয়ে বুলুর সঙ্গেই খুকুর খাতির হয়েছিল বেশি।

শোভনার জন্ম হয়েছিল আসামের ডিব্রুগড়ে। আপনার চেয়ে ১৪ বছরের ছোট ছিল সে। শোভনার বাবা, আপনার সেজো কাকা, এন্ট্রান্স পাস করেই পালিয়ে চলে যান শিলংয়ে। বন বিভাগে যোগ দেন খুব নিচু পদে। কাজ করেছেন, আর পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন সেজো কাকা। ফলে তাঁর উন্নতিও হতে থাকে, চাকরিতে, বৈষয়িক জীবনে, তিনি পদোন্নতি পেয়ে হন ডেপুটি ফরেস্ট কনজারভেটর। অর্থবিত্ত হয়। শিলংয়ে বাড়ি হয়। শোভনাও

থাকত ওই বাড়িতেই। ডিব্রুগড়ের স্কুলে পড়ত শোভনা।

আপনি একবার শিলংয়ে গিয়েছিলেন। সেজো কাকা আপনাকে সেখানে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার কি আর এই সব চাকরিতে মন বসে। আপনি দিনরাত ঘরের মধ্যে ঘাড় গুঁজে কবিতা লেখা, আর সময় পেলে হেঁটে হেঁটে শিলং ডিব্রুগড়ের পাহাড়ি পথ, উচ্ছ্বসিত ঝরনা, সারি সারি পাইনগাছ দেখে বেড়ানো।

তখন শোভনা পড়ে ক্লাস এইটে। বয়স তেরোর মতো। আপনার ২৭ তাহলে। আপনার সৃষ্টির সবচেয়ে ভরভরাট মৌসুম যেটা। যখন *ঝরা পালক*-এর নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথীয় অনুসৃতি থেকে আপনি বেরিয়ে আসছেন। আর আপনি লিখছেন নির্দিষ্ট নারীকে নিয়ে কবিতা, *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বইয়ে যে কবিতাগুলো ঠাঁই পাবে, যেগুলো প্রকাশিত হতে থাকবে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত *প্রগতি* পত্রিকায়। *কালি ও কলম*-এ। *ধূসর পাণ্ডুলিপির* প্রথম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর'-এই আপনি জানিয়ে দিলেন কেন আর কাকে নিয়ে আপনি লিখছেন এই সব :

তুমি তো জান না কিছু না জানিলে,–
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের পরে পরে শুয়ে রবে নাকি!

'সহজ' কবিতায় আপনি লিখলেন,

তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর!—
মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে,—কত দূরে।

আর আছে ওই '১৩৩৩'-শীর্ষক কবিতা।

শোভনা মজুমদার, তার জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে, তখন তার বয়স ৯০ ছুঁই ছুঁই—এ বয়সের কারও সাক্ষ্য আমরা গ্রহণ করব কি না জানি না—ভূমেন্দ্র গুহকে জানাচ্ছেন, 'মিলুদা *ঝরা পালক* আমাকেই উৎসর্গ করেছিল।'

আর তাদের ডিব্রুগড়ের বাড়িতে এসে, কাজের বদলে বসে বসে কবিতা লিখত শোভনার মিলুদা। আর দরজা বন্ধ করে শোভনাকে নিয়ে সদ্য লেখা সেই সব কবিতা শোনাতেন আপনি। শোভনার কী যে ভালো লাগত আপনার গলায় কবিতাপাঠ শুনতে! ভালো লাগত আপনার কণ্ঠস্বর, আপনার কবিতার শব্দ, বাক্য, ছন্দ, ভালো লাগত স্বরের ওঠানামা, শব্দের সঙ্গে বেরিয়ে আসা উষ্ণ শ্বাস, আপনার নাসারন্ধ্রের সংকোচন-প্রসারণ, আপনারও ভালো লাগত ওই কিশোরীকে, সে ঘরে এলেই বাতাসে একটা নোনা গন্ধ, দরজা বন্ধ, দুজনে কবিতা পাঠ চলছে, এই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটা ছোট্ট পরিসরে, সেখানে কেবল দুজন, আর কেউ নেই, একজন মানব একজন মানবী...

শোভনার মা সরযূবালা ধীরে ধীরে বিরক্ত হতে লাগলেন, দরজা বন্ধ করে কী এত কবিতা শোনা। সেই সব দরজা বন্ধ করে কবিতাপাঠের দিনগুলোতেই কি ঘটেছিল সেই কবিতার মুহূর্তটি—তোমার শরীর, তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তারপর, মানুষের ভিড়...

যেমনটি লিখেছিলেন 'প্রেম' নামের কবিতায়,

একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন—একরাত;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে...

মা বিরক্ত হচ্ছেন বটে, মেয়েকে ধমক দিচ্ছেন, 'বেবি, কবিতা শোনার বাতিকটা আবার কবে তোমার তৈরি হলো, আর দরজা বন্ধ করে কবিতা শুনতে হবে কেন?'

'মিলুদা যে বড় লাজুক মা। তোমাদের সামনে সে কবিতা পড়বেই না।'

'না পড়লে না পড়ুক। তবু দরজা বন্ধ করতে নেই।'

'মিলুদা তো আমার দাদা।'

'হোক দাদা। তবুও।'

যত দিন মিলুদা, আপনি জীবনানন্দ দাশ, ছিলেন ওই শৈলশহরে, তত দিনই আপনি কবিতার ঘোরের মধ্যে ছিলেন, আর কিশোরী শোভনাকে সেই

কবিতা শুনিয়ে গেছেন।

বিকেলে অবশ্য এসে পড়তেন আপনাদের সেজো কাকা। তাঁর ঝোলাভরা থাকত শিকারের গল্প। সেজো কাকা তাঁর ডেকচেয়ারে বসেছেন, আপনি বিড়াল-পায়ে হাজির তাঁর কাছে, শিকারের গল্প শুনতে পছন্দ করতেন খুব। তবে কোনো দিন শিকারে যাওয়ার ইচ্ছাটা অবশ্য হয়নি।

একবার সেজো কাকারা গেলেন নৌবিহারে, আপনি যাবেন না, শোভনাও জানিয়ে দিলেন, তিনিও যাবেন না, কিন্তু মা কিছুতেই মেয়েকে একা-বাসায় তার মিলুদার সঙ্গে থেকে যেতে দিতে রাজি নন; মায়ের সঙ্গে শেষে ঝগড়াঝাঁটি হবে ভেবে মিলুদাকে একা ফেলে রেখে শোভনা গিয়ে উঠলেন নৌকায়।

এই সব শিকারের গল্পই একদিন কবিতা হয়ে বেরোল আপনার হাত থেকে—'ক্যাম্পে' শীর্ষক কবিতাটা!

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারা রাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারা রাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;

তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে!

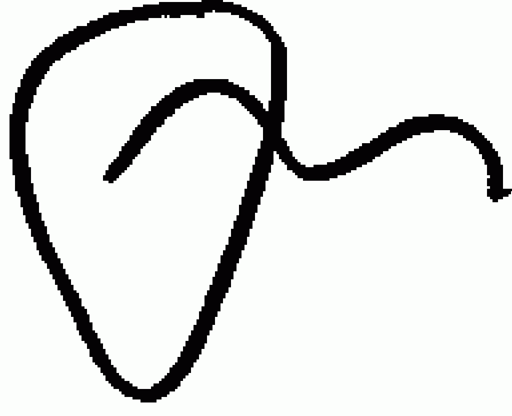
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়,—

এইখানে হৃদয়ের বোন শব্দটা আপনি কেন ব্যবহার করলেন, জীবনানন্দবাবু! বনের সঙ্গে বোনের অনুপ্রাসটা একটা কারণ, আর আপনি *শনিবারের চিঠির* আক্রমণের উত্তরে যা লিখেছিলেন, শেলির সোল'স সিস্টার পাশ্চাত্য কবি-সমালোচক-পাঠকদের গভীর আদরের বিশেষণ; কিন্তু 'হৃদয়ের বোন' (এই এক্সপ্রেশনটার জন্য শেলির কাছে আমি ঋণী), সেটাও তো কারণ বটে, কিন্তু এই বোন শব্দটার পেছনে আপনার কাকাতো বোন শোভনার কোনো ভূমিকা নেই তো!

এরপর শোভনা আরও কয়েকবার এসেছেন বাবা-মার সঙ্গে বরিশালে, কখনো কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, আপনি আপনার ঘরে বসে লিখছেন, হঠাৎ শোভনা ঢুকে পড়লেই আপনি অপ্রতিভ হয়ে পড়তেন।

আপনার ২৭ বছর বয়সে আপনার প্রথম বই *ঝরা পালক* আপনি উৎসর্গ করলেন শোভনাকে। বই একটা ডাকযোগে পৌঁছে গেল, উৎসর্গের খবরটা আপনি ঠিকই জানালেন শোভনাকে, গোপন রাখার চেষ্টা হলো বাইরের লোকদের কাছে। কিন্তু কী করে কী করে সবাই একদিন জেনে গেল মিলুদা তার কবিতার বই উৎসর্গ করেছে শোভনাকে, তখন শোভনার মা সরযূবালা সেটা শুনেও না শোনার ভান করলেন। যেন কোথাও কিছুই ঘটেনি।

কিছুই ঘটেনি! বাস্তবজগৎবাসীর কাছে হয়তো তাই। কিন্তু আপনি কবি, আপনার জীবনে ঘটে গেল এক অপার্থিব বিক্রিয়া, এরপর আপনি আমৃত্যু এই স্মৃতি এই সংরাগ ধরে রাখবেন। যন্ত্রণাদগ্ধ হবেন। আপনি কিছুতেই তাকে এড়াতে পারবেন না। সে জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়েই যাবে।



জোনাকির রঙে ঝিলমিল

বিয়ে করতে হবে। পিসেমশাই মনোমোহন চক্রবর্তী ধরে বসলেন আপনাকে, 'কিরে মিলু, তুই বিয়ে করবি না?' মেজো জ্যাঠাইমাও কম যান না, 'কুসুম, তোমরা পোলারে বিয়া দিবা না?'

আপনি কবিমানুষ। স্বভাবতই রোমান্টিক। একটা নারী আপনার জীবনে আসবে, আপনাকে উদ্বোধিত করবে, প্রাণিত করবে, এটা তো আপনার চিরকালের প্রত্যাশা। কিন্তু কে হবে সেই মেয়েটি?

বেবি? শোভনা? তা হয় না। কাজিনদের মধ্যে বিয়ে হওয়ার নয়। আর সে বোধ করি কাউকে পেয়ে গেছে, তার দিদির বিয়ের সময় কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছে...

আয়নার সামনে দাঁড়ান আপনি! নিজেকে একবারও সুপুরুষ বলে মনে হয় না আপনার। গায়ের রং ময়লা, গ্রীবা নেই বললেই চলে, একটু মোটার ধাঁচ, চোখে-মুখে এমন কিছু নেই, যাতে নিজেকে একটু সুপুরুষ বলা যেতে পারে! এই রকম একটা ছেলেকে বিয়ে করতে বয়েই গেছে শোভনার! তাহলে? এ জীবনে কি নারীকে ছুঁয়েছেনে দেখা হবে না?

শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাস তো খোঁচা দিয়েই রেখেছেন, "কবি সব করিয়াই দেখিয়াছেন। শুধু বিবাহ করিয়া 'মেয়েমানুষেরে' দেখেন নাই। দেখিলে ভালো হইত, গরিব পাঠকেরা বাঁচিত!" সত্যি, এবার বিয়ে করেই দেখতে হয়। দেখা যাক, গরিব পাঠকেরা বাঁচে, নাকি আমি নিজেই বেঁচে যাই। ভাবেন আপনি!

এর মধ্যে আপনার সিটি কলেজের অধ্যাপকের চাকরিটা চলে গেছে। কারণ কী? কারণ নিয়ে বঙ্গদেশে নানা কাহিনী প্রচলিত। একটা হলো,

আপনার 'ক্যাম্পে' কবিতাটা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়েছিল, তাই তারা আপনাকে চাকরিচ্যুত করেছে। আরেকটা হলো, 'ক্যাম্পে' নয়, 'পিপাসার গান' কবিতায় 'ফসলের স্তন' কথাটা লেখার জন্যে আপনার চাকরি চলে যায়। পরেও আপনি 'ফসলের গান' কবিতায় লিখেছিলেন, 'চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল/ তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল...'। বুদ্ধদেব বসু *স্মৃতিকথায়* 'ক্যাম্পে' কবিতার কারণে আপনার চাকরিচ্যুতির কথা লেখা ছাড়াও *দেশ* পত্রিকায় ১৯৭৫ সালে একটা নাটিকা লেখেন *চরম চিকিৎসা* নামে। কিন্তু এ সবই ঘটেছিল আপনার চাকরি খোয়ানোর বছর খানেক বা দুয়েক পরে। আপনার চাকরি যাওয়ার কারণ সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা নিয়ে ছাত্রধর্মঘট। ব্রাহ্মবাদী এই কলেজে এর আগে কখনো মূর্তিপূজা হয়নি, এবার ছাত্ররা তা করতে চাইলে কর্তৃপক্ষ কঠোরতা অবলম্বন করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সজনী দাস প্রমুখ কলেজ কর্তৃপক্ষের সমর্থনে কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করে সভা করতে শুরু করলে ধর্মঘট, গ্রেপ্তার ইত্যাদি জটিলতা তৈরি হয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ আড়াই হাজার ছাত্রের মধ্যে দুই হাজার ছাত্রকে বহিষ্কার করে, অথবা ছাত্ররা নিজেরাই কলেজ ছেড়ে দেয়, ফলে নিদারুণ অর্থসংকটে পড়ে কলেজ, তখন বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ শিক্ষকসংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়, কনিষ্ঠ চাকুরে হিসেবে সবার আগে চাকরি যায় আপনার।

তবু মনে হয়, কনিষ্ঠ হিসেবেই কেবল নয়, আপনার চাকরি যাওয়ার পেছনে আপনি অশ্লীল কবিতার লেখক, এটিও কলেজ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় ছিল। আর ওই সময় ব্রাহ্মবাদীরা যেকোনো নিরীহ প্রেমের কবিতাকেও অশ্লীল বলে মনে করতে পারতেন।

কিছুদিন এদিক-ওদিক করার পর পুরোনো দিল্লি থেকে দূরে শুকনো উষর কালাপাহাড় এলাকায় রামযশ কলেজে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন আপনি। কিন্তু বাংলার বাইরে আপনার ভালো লাগে না। সেই শুষ্ক দিল্লির রুক্ষ প্রান্তরে নেমে আসে করাল গ্রীষ্ম। কোথায় আপনার ধানসিড়িটির তীর, আম-জাম-কাঁঠালের হিজলের-তমালের দেশ, আর কোথায় পোড়ো জমির মতো পড়ে থাকা দিল্লির বাইরের প্রান্তর। আপনার মন কি আর টেকে!

দিল্লি স্টেশনে নেমেই আপনি মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন। আপনার নিজেকে লেগেছিল হালভাঙা নাবিকের মতো। সুধীর কুমার নামের এক ব্রাহ্ম বন্ধুজন আপনাকে দিল্লির রেলস্টেশনে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে আপনার মনে পাখির নীড়ের মতো নিশ্চয়তা আর আশ্রয়ের আশ্বাস জেগে উঠেছিল। সেটা ১৯২৯-এর ঘটনা। সুধীরের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে পাখির নীড়ের মতো উপমাটা আপনি ব্যবহার করেছিলেন। অতি দূরবর্তী স্থানে অচেনা পরিবেশে অপরিচিত মানুষের ভিড়ে একটা সুহৃদ স্বজনের মুখ ঠিক যেন একটা পাখির নীড়। তখন থেকেই নিশ্চয়ই আপনি এই উপমাটা যুৎসই প্রয়োগের একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। আরো কয়েক বছর পর বনলতা সেনকে নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে আপনি এই উপমাটা প্রয়োগ করবেন।

আপনি সারাক্ষণ তক্কে তক্কে ছিলেন কীভাবে বেরোনো যায় এই দিল্লির দূর-অস্ত চক্র থেকে।

বৈশাখ মাসেই আপনি চলে আসেন বরিশালে, চাকরি পাওয়ার পঞ্চম মাসের মাথায়।

তখনই শুরু হয় আপনার বিয়ের আলোচনা।

আপনার মেসোমশাই বরিশাল বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রসরঞ্জন আপনাকে এসে একদিন ধরলেন, 'চলো বাবা, একটা জায়গায় যেতে হবে। একটা পরিষ্কার পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে নিয়ো।'

'কেন মেসোমশাই?'

'আরে কনে দেখতে যাব। শুধু তুমি যে কনেকে দেখবে, তা তো নয়, কনেও তোমাকে দেখে ফেলতে পারে। আজকালকার মেয়ে, বলা যায় কিছু!'

আপনার মনে সেই আদি রোমান্টিকতা, নারী তো আপনার কাছে কেবল একটা সাড়ে তিন হাত মূর্তি নয়, একটা ধারণা, একটা অস্তিত্ব, অনেক স্বপ্নকল্পনার এক সারাৎসার রূপ। আপনি 'না' করলেন না।

বিরাট বড়লোকের বাড়ি। আপনাদের তারা গ্রহণ করল পরম যত্নে। আপ্যায়ন না তো এলাহি কাণ্ড। একসময় অলংকারভারে বিনতা কনেটি এল আপনাদের সামনে। মেসোমশাইয়ের মুগ্ধতার সীমা নেই। তার ওপর পাত্রীপক্ষের স্পষ্ট প্রস্তাব, আপনাকে তারা বিলেত পাঠাবে, সেই দিক থেকেও আয়োজনে কোনো ত্রুটি থাকবে না।

আপনারা ফিরে আসছেন। মেসোমশাই বারবার করে জিজ্ঞেস করছেন, 'বাবা, পাত্রী পছন্দ হয়েছে তো!'

আপনি তখন তাকিয়ে দেখছেন বাংলার রূপ, কী সুন্দর অশ্বত্থডালে পাতাগুলো বাতাসে চোখের পাতার মতো কাঁপছে, বাঁশঝাড়ের নিচে বেতফলের ঝাড়, বেতফলগুলো কার ম্লান চোখের মতন, তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব...

'লুচিটা খাঁটি ঘিয়ে ভাজা ছিল, কী বলো?'

'তা তো বলতেই হবে।'

পরের দিনই ওরা গাড়ি পাঠিয়ে দিল। মেসোমশাই এসে বললেন, 'মিলু, তৈরি হয়ে নাও। ওরা তো গাড়ি পাঠিয়েছে।'

আপনি বললেন, 'আমি কী আর তৈরি হব। আপনি তৈরি হয়ে নিন।'

মেসোমশাই হেসে উঠলেন, 'সেকি কথা, বিয়ে করবে তুমি আর তৈরি হব আমি!'

আপনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'যেখানে বিয়ে করব না বলেই ঠিক করেছি, সেখানে দ্বিতীয়বার যাওয়াটাও আমি অনুচিত বলেই মনে করি।'

লাবণ্যপ্রভা ঢাকার মেয়ে। তবে বড় দুঃখের জীবন মেয়েটার। লাবণ্যর বয়স যখন সাত বছর, তিন মাসের মধ্যে মা-বাবা দুজনই মারা যান। চার ভাইবোন অগাধ জলেই ভেসে যেতে পারত, কিন্তু অকৃতদার জেঠামশাই তাদের মানুষ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। লাবণ্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছেন। ক্লাসে ভীষণ পড়ার চাপ। লাবণ্য তা নিয়েই মত্ত।

এ ছাড়া তার আরেকটা মত্ততা আছে। স্বদেশিদের সঙ্গেও তার আছে গোপন ও প্রকাশ্য যোগাযোগ।

লাবণ্য যারপরনাই সুন্দরী। কাটা কাটা নাকমুখ, সুন্দর আয়ত চোখ, তরবারির মতো দেহের গড়ন। ঢাকার ছেলেরা তাকে সময় দিতে চাইবেই।

হঠাৎই খবর এল, জেঠামশাই লাবণ্যকে ডেকে পাঠিয়েছেন। লাবণ্য মহা বিরক্ত। এমনিতেই পিচপিচ করে বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাটে কাদা থকথক করছে। এর মধ্যে পড়াশোনা ফেলে রেখে বাসায় যেতে হবে। কী এমন জরুরি দরকার পড়ল জেঠামশায়ের।

লাবণ্যর পরনে শাড়ি। হাতে ছাতা। মাথায় বিনুনি। শাড়ির আঁচল

কোমরে শক্ত করে বাঁধা। পায়ের আঁচল আর জুতার রং কাদা মেখে এক হয়ে গেছে। বাসায় ঢুকতেই সামনে পড়লেন লাবণ্যর দিদি। তিনি বেথুন কলেজে পড়েন, দু দিন আগে এসেছেন কলকাতা থেকে। দিদি ছোট বোনটির এই রকম দারোগামার্কা মূর্তি আর কাদামাখা শাড়ি-জুতা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েন আর কি! লাবণ্য বললেন, এত হাসির কী হলো, কিছু একটা খেতে দিয়ে দয়া করে আমাকে বাধিত করো, তারপর হেসো...

এমন সময় দোতলা থেকে ভেসে এল জেঠামশায়ের কণ্ঠস্বর, 'মা লাবণ, কয়েকখানা লুচি নিয়ে এসো তো!'

দিদিও লুচির বাটিটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। লাবণ্য দোতলায় গেলেন। দেখলেন, জেঠামশাইয়ের সামনে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। 'এই যে মা, এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এঁর নাম জীবনানন্দ দাশ। ইনি এসেছেন দিল্লি থেকে।'

লাবণ্যর তখন আবারও হাসবার পালা। দিল্লি থেকে এসেছেন ভদ্রলোক, আর তাঁর সামনে তিনি এই রকম কাদামাখা শাড়ি পরে এসে গেছেন। তিনি হাসি সামলাতে না পেরে একটা টুলের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন। পিঠটা দিয়ে রাখলেন আপনার দিকে।

জেঠামশাই বললেন, 'ওকি, পেছন ফিরে বসেছ কেন! ঠিক হয়ে বসো। ভদ্রলোক কী মনে করবেন। বাড়িতে অতিথি এলে তাকে ঠিকভাবে আপ্যায়ন না করাটা ভারি অন্যায় লাবণ। উনি কী ভাবছেন, বলো তো!'

আপনি তখন কী ভাবছিলেন, জীবনানন্দ দাশ। সেই সুশ্রী মুখ আর উচ্ছ্বসিত হাসি তখনই আপনার চিত্ত বুঝি জয় করে নিল। আপনি ধৈর্য ধরে চুপটি করে রইলেন কখন মেয়েটি মুখ ফেরাবে। আপনি কি তখন, যেকোনো মেয়ের সামনে গেলেই যে রকম বিব্রত হন, সেই রকম অপ্রস্তুত? জেনেবুঝেই তো গেছেন ওই বাড়ি। মেয়েটির বাবার বাড়ি খুলনা। ব্রাহ্মসমাজেরই মেয়ে। অনাথ হলেও পাটনায় পড়ে এসেছেন, ঢাকায় পড়ছেন, চালাক-চতুর।

মেয়েটি হাসি থামিয়ে আপনার দিকে মুখ ফেরালেন। লুচির পাত থেকে হাত তুলে আপনি বললেন, 'আপনার নাম কী?'

'শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা গুপ্ত।'

'আইএতে কী কী সাবজেক্ট নিয়েছেন? কোনটি আপনার বেশি পছন্দ?'

জবাব দিলেন লাবণ্য। তারপর সোজা নেমে গেলেন নিচে। দিদিকে

সামনে পেয়ে তার পিঠে দু-চারটা কিল দুমদাম বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কে রে এই ভদ্রলোক? কেন এসেছেন! এঁর জন্যে আমাকে হোস্টেল থেকে এইভাবে ডেকে আনার মানেটা কী?'

দিদি চোখে রহস্যময় হাসি ঝুলিয়ে বললেন, 'এঁ কে, সে তো তোর জানবার কথা। আমার জানবার কথা নয়।'

একটু পরে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যর জেঠামশাই দোতলা থেকে নেমে চলে এলেন বাইরে। আপনার বিদায় নেওয়ার পালা। মেয়েটিকে আপনার পছন্দ হয়েছে বলতে হবে। আপনি সেটা বিদায় নেওয়ার আগেই জানিয়ে যেতে ভুললেন না।

নিচে লাবণ্য বসে ছিলেন। আপনাদের দেখামাত্র তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

দুপুরবেলা জেঠামশাই লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা লাবণ মা, সকালের ভদ্রলোকটাকে তোমার কেমন লাগল?'

লাবণ্য পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'উনি কেন এসেছিলেন?'

'তাহলে বলি শোনো। উনি দিল্লির রামযশ কলেজের অধ্যাপক। তোমাকে দেখতে এসেছিলেন।'

লাবণ্য দাশ চোয়াল শক্ত করে জানিয়ে দিলেন, 'বিএ পাস না করা পর্যন্ত জেঠামশাই, আমার বিয়ের নাম মুখেই এনো না। এটা আমার ভাবনাতেও নেই।'

জেঠামশাই লাবণ্যকে দুপুরের পর তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'মা। তোমার বাবা-মা দুজনই অসময়ে চলে গিয়ে আমার ওপর এই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তোমাদের ভার আমার ওপর। তোমাদের একটা সদ্‌গতি না হওয়া পর্যন্ত তো আমি চোখ বুজতে পারব না। ভগবান না করুন, এখনই যদি আমি চোখ বুজি, পরপারে গিয়ে তোমার বাবা-মা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, *আমার মেয়েগুলোর তুমি কী ব্যবস্থা করে এসেছ,* আমি কী জবাব দেব? আমার শরীরটা ভালো না। যেকোনো সময় মারা যেতে পারি। তোমার দিদির বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। ছোটটা এত ছোট, ওর বিয়ের প্রশ্ন এখন আসছে না। তোমাকে নিয়েই আমার অনেক দুশ্চিন্তা। আর ঢাকা জায়গাটা ভালো না। সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া এটা। রামযশ কলেজের ইংরেজির

প্রফেসর। বরিশালের বিখ্যাত ব্রাহ্মবাড়ির ছেলে। তাঁকে অপছন্দ কেন হবে, সেটাও বুঝছি না।'

লাবণ্য বললেন, 'ভদ্রলোকের মত না জেনেই আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?'

জেঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'তিনি সকালে তোমাকে দেখেই মত দিয়েছেন।'

লাবণ্য অবাক হলেন। এই কি কনে দেখা? তবে যে তিনি জেনে এসেছেন দেখে এসেছেন, বরপক্ষের লোকেরা গরু-দেখার মতো করে কনে দেখে, নানাভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে কনেকে সামনে আনতে হয়, তারা একবার হাঁটায়, একবার চুল খুলতে বলে, নানা কিছু জিজ্ঞেস করে...

বিয়ের দিন-তারিখ চূড়ান্ত হয়ে গেল।

ওই বিয়ের সময় আপনারা পুরো পরিবার একসঙ্গে একটা ছবি তুললেন। সর্বমোট ৪১ জন আছে আপনাদের পারিবারিক ওই গ্রুপ-ছবিতে। আপনার বাবা-কাকা-জেঠা-পিসেরা আছেন, তাঁদের স্ত্রীরা আছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা আছে, তাঁদের নাতি-নাতনিও আছে। হ্যাঁ, শোভনাকেও দেখতে পাচ্ছি ওই ছবিতে, চোখে চশমা পরা ১৭ বছরের মেয়েটি, বেশ রূপসীই দেখা যাচ্ছে তাকে।

বিয়ের এক বছর পর আপনি একটা গল্প লিখেছিলেন, জীবনানন্দ দাশ। বরিশালে বসেই। গল্পটার নাম?

'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়'।

গল্পটা যথেষ্ট ভণিতা করে শুরু করা। বিনোদ নামে এক গল্পকার তার নিজের জীবনের গল্প লিখছে। গল্পটা এত স্বব্যাখ্যাত যে, আমার আর কিছু বলার দরকার পড়ে না। বিনোদ বলেই দিয়েছে, গল্পকার সে, এ তার নিজের জীবনেরই গল্প, শুধু পাত্রপাত্রীর নামগুলো পাল্টে দেয়া। আমাদের বারবার মনে হবে, এই গল্প যেন আপনার নিজের জীবনেরই গল্প। সেই গল্প অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে যাব আপনার বিয়ের দিনগুলোয়, রবাহূতের মতো।

বৈশাখের ওই রোদ-তাতানো দিনগুলোয় কাঁঠালগাছের ছায়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির বিস্তারিত বাগানের আনারসগুলোয় সোনারঙের আভাস দেখে আপনি একটু থমকে দাঁড়ান। কাঁঠালগাছে এঁচোড় এসেছে। কতগুলো

এঁচোড় লাল কাঁঠালপাতার সঙ্গে ঝরে মাটিতে পড়ে আছে। কলেজে পড়ার সময় আপনি কলকাতা থেকে পলনির গোলাপের চারা এনেছিলেন, সেই ফুল রোদে কেমন বিবর্ণ। একটা পড়া এঁচোড় হাতে তুলে নিয়ে আপনি ভাবছেন আরেক কথা। শোভনা আপনাকে চিঠি লিখেছেন।

জানিয়েছেন তিনি বিয়েতে আসছেন। একা আসছেন না, বোর্ডিংয়ের আরও চারটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। স্টিমারে আসবেন তারা। মিলুদা যেন তাকে রিসিভ করতে স্টিমারঘাটে আসেন। বিয়েতে যে অনেক মজা হবে, সে-সম্পর্কে তিনি বড় উচ্ছ্বসিত। কী কী করবেন তারা, কত রকমের আমোদ-স্ফূর্তি, সেসবের বিশদ বর্ণনা তার চিঠিটাতে ভরা। এই সুশীল স্বাভাবিকতা আপনার বেদনাটা আরও বেশি গভীর করে তোলে। আপনি আফসোস করে ওঠেন ভেতরে ভেতরে, যদি একটা লাইনও থাকত যে শোভনার উদাসীনতাটুকুন কৃত্রিম! একটা লাল রঙের ঝরা কাঁঠালপাতা তুলে নিয়ে আপনি সেটা অলক্ষ্যে ছিঁড়তে থাকেন।

আর সামনে যিনি আসছেন জীবনসঙ্গী হয়ে! লাবণ্য! তাঁকে পেলে কি আপনি চিরজীবনের জন্যে ভুলে যাবেন শোভনাকে!

অন্যদিকে বিয়ের খরচাপাতি নিয়েও চিন্তা হয়। সিটি কলেজের চাকরি, আরও দুটো চাকরি থেকে যা আয় করেছেন, তাতে সঞ্চয় কিছু নেই হাতে। বিয়েতে ঋণ হয়ে যাবে। আর দিল্লির চাকরিটা আপনি ছেড়ে আসেননি যদিও, কিন্তু ফিরে গিয়ে সেই চাকরি আর থাকবে কি না সন্দেহ। আর ফিরতে আপনি চানও না ঠিক। বাংলার বাইরে গেলে আপনার দমবন্ধ লাগে।

গোটা কয়েক চুরুট কিনতে হবে। এমনিতেই আপনি চুরুট-তামাকে অভ্যস্ত নন, ভালোমতো অগ্নিসংযোগই করতে পারেন না, কিন্তু শোভনার চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে শূন্যের মধ্যেই অগ্নিসংযোগ করে কাল্পনিক চুরুট ফুঁকছেন আপনি।

ঘরের ভেতর গিয়ে আবার চিঠিটা বার করেন। আবার আদ্যোপান্ত পড়েন চিঠিটা। না, কোথাও বিয়ে হয়ে যাওয়া নিয়ে কোনো খেদ নেই, অভিমান নেই, একটু হতাশা নেই, আপত্তি নেই। মেয়েরা কীভাবে পারে এতটা!

জানেন আপনি, শোভনার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক, তার কোনো

পরিণতি সম্ভব নয়! সেটা জেনেই আপনি বিয়েতে মত দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে এই এত দিনের সম্পর্ক, তার পুরোটাই অপচয়!

চুরুট জ্বালিয়ে কয়েকটা টান দেন। তারপর বাঁ হাতে চুরুটটা দু আঙুলে ধরে বাকি আঙুল আর আরেকটা হাতে চিঠিটা ছিঁড়তে থাকেন। বৌভাতে অনেক লোক-অভ্যাগতে ভরে যাবে বাড়িটা, কারও নজরে পড়ে যেতে পারে।

আরেকবার মনে হয়, পড়লেই কী। এই চিঠি পড়লে ছোট বোন দাদাকে লিখেছে, এর চেয়ে বেশি কোনো কিছুই উদ্ধার করতে পারবে না কেউ।

তবু চিঠিটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করেন। দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরে পোড়ান টুকরো কাগজগুলো। কাগজের পুড়ে যাওয়া দেখে, অক্ষরের ছাই হয়ে যাওয়া দেখে হঠাৎ বুকটা ধক্ করে ওঠে আপনার।

সবটাই কি তাহলে অপচয়? এত দিনকার সম্পর্ক! শিলংয়ের দিনগুলো!

শোভনারা এসেছেন সর্বানন্দা ভবনে। ওঁর মা সরযূ কাকি, অতুল কাকাও এসেছেন। কয়েকবার আপনার সঙ্গে চোখাচুখি হয়েছে শোভনার। কিন্তু আপনিই তাকে এড়িয়ে গেছেন। এই রকম একটা চিঠির পরে কী কথাই বা বলবেন তার সঙ্গে!

সারা রাত ঘুম হলো না! উঠে বাগানে পায়চারি করলেন। আকাশে সাতটি তারা, সপ্তর্ষিদের দেখলেন! কালপুরুষ, আদমসুরত! জীবনটা কি তার অপচয়িতই হয়ে গেল! কী লিখেছেন আপনি এত দিন! সবই কি শোভনার চিঠিটার মতো কালের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! ত্রিশটা বছর স্রেফ অপচয়! আর শোভনার সঙ্গে তার এই যে গাঢ়তা, তাও অপচয়!

সকালবেলা ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম ভাঙল শোভনার ডাকে, 'ঘুমিয়ে আছ মিলুদা!'

আপনার একটু ধন্দমতো লাগে। সত্যি কি শোভনা!

শোভনাই।

'চা এনেছি, ওঠো ওঠো।'

শোভনা চলে যান। আপনি বিছানা ছেড়ে বাইরে যান। চোখমুখ ধুয়ে এসে চা নিয়ে বসেন।

তখন আবার আসেন তিনি। রাতের ঘুমের প্রশান্তি আর স্রস্ততা তার শরীরে মুখে শাড়িতে। তিনি বলেন, 'কই, উঠলে! এত বেলা করলে যে! কাল রাতে ঘুমিয়েছিলে!'

'ঘুমিয়েছিলাম বৈকি।'

'কিন্তু আমার যে মনে হলো ঘুমোওনি!'

'কেন এ রকম মনে হলো তোমার?'

'কারণ আমি তোমাকে রাতের বেলা পায়চারি করতে দেখেছি।'

'কোথায়?'

'আমগাছগুলোর ভেতরে। মাঠে। রাত তখন একটা-দেড়টা।'

'অত রাতে জেগে ছিলে তুমি?'

'আমরা বোর্ডিংয়ের চারটি মেয়ে মিলে কার্ড খেলছিলাম!'

'ও। রোজ রাতে খেল নাকি?'

'না। কাল রাতে খেলেছি। জানালার ধারে বেতের চেয়ারে বসে ছিলাম আমি। মাঝেমধ্যে বাইরে তাকাচ্ছিলাম। খুব এনজয় করেছি কাল রাতটা। তাসে জিতেছি। তোমাকে দেখলাম তুমি একটা মটকার চাদর গায়ে জামাইবাবুর মতো ফিরলে।'

'তাই নাকি! তুমি দেখলে?'

'না মিলুদা। ঠিক জামাইবাবুর মতনও নয়। ভবঘুরের মতন। খালি গা, পরনে নোংরা খদ্দর, এলোমেলো চুল, চাদরটা ঠিকমতো জড়িয়ে নাওনি। কী এত জ্যোৎস্নাপুকুর আকাশ দেখছিলে। আমি হাততালি দিলাম। বারবার তাকালাম। একবার ভাবলাম নাম ধরে ডাকি মিলুদা মিলুদা বলে, কিন্তু বিয়েবাড়িতে এত মানুষ, এত আচার, নিয়মকানুন, কে না কে কী ভেবে বসে, তাই আর চিৎকার করলাম না।'

'আজকে যে চা নিয়ে এলে বড়!'

'আমি বুঝি কোনো দিনও তোমাকে চা এনে দিইনি!'

'আজকে যে আবার খানিকটা এই ঘরে বসলেও!'

'শোনো। আমি অনেকবার তোমার সামনে এসেছি। তুমিই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তোমাকে লিখলাম স্টিমারঘাটে আমাদের রিসিভ করতে যেতে, তাও এলে না। আমরা তোমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছি, কতটা ভদ্রতাই না তুমি করছ।'

'তোমার বন্ধুবান্ধব তো আমি চিনি না। তবে বাড়ির অন্যেরা নিশ্চয়ই ওদের সমাদর করছে।'

'আর আমাকে তুমি চেনো বলেই উপেক্ষা করছ। একবার কাছে আসতেও বলবে না!'

'কী করে বলব?'

'কিন্তু তোমাকে তো আমি খুব জানি। ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিলে। কিন্তু কী রকম সংযমশক্তি বাবা তোমার!'

'আর তোমার রকমটাই কি আমি বুঝছি। আমার বিয়েতে তোমার এত আনন্দ কেন?'

শোভনা মুখটায় কোনো ভাবান্তর না এনে বললেন, 'তোমার বিয়েতে কি আমার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল?'

'অতটা আশা করিনি। কিন্তু এলে কেন? আর এলেই বা যদি, এত পরিতৃপ্তি কেন? নিজের ভালোবাসাকে চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখলে মানুষ ব্যথা পাবে না? তার মানে তুমি আমাকে এ ক বছর ভালোবাসোনি শোভনা!'

শোভনা বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'আমি যদি তোমার আগে বিয়ে করতাম, তুমি কী করতে!'

'তুমি তো আমাকে কখনো সেই রকম করে ভালোবাসোনি, শোভনা!'

আপনি একটা চুরুট জ্বালেন। শোভনা বলেন, 'তুমি ওই চুরুটটা রাখো তো মিলুদা, তোমাকে একদম মানায় না। আচ্ছা বলো, আমি যদি তোমার আগে বিয়ে করতাম, আমার বিয়েতে আসতে না তুমি!'

'না।'

'আমাকে চিঠিও লিখতে না!'

'না।'

'মনে মনে কোনো মঙ্গলবাসনা করতে না!'

'ধরো আমার সবচেয়ে প্রিয় বইটাতে কেউ যদি কালির আঁচড় দেয়, আমি তাতে মঙ্গলবাসনা করতে পারব? আমার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার জিনিস তুমি। তুমি যদি কাউকে ভালোবেসে হোক, না ভালোবেসে হোক, অনিচ্ছাতেই হোক, বা খুব ইচ্ছাতেই হোক, মন না হোক অন্তত শরীরটা সমর্পণ করো, সেখানে তুমি বুঝে দেখো আমি মঙ্গলবাসনা করতে পারব কি

না!'

'তোমার ভালোবাসা চিরকাল থাকবে? কোনো ভালোবাসাই চিরস্থায়ী হয়?' সতেরো বছরের মেয়েটি কী দারুণ বৈদগ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে!

আপনি কোনো জবাব দেন না। বাইরে শোভনার বন্ধুরা 'বেবি, বেবি' বলে ডাকছে বুঝি। শোভনা ওঠেন।

'যাওয়ার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি কি আমাকে এখনো ভালোবাস?' শোভনার গমনোদ্যত ভঙ্গি থমকে দাঁড়িয়ে আছে, তা উত্তর চায়।

আপনি বলেন, 'বাসি বটে, কিন্তু একদিন যে বাসব না, তাও বুঝি।'

শোভনা চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আপনার চুরুটটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পেয়ালার অবশিষ্ট তরলে সঁপে দেন।

বিয়ের তারিখ ঠিক হলো ২৭ বৈশাখ ১১৩৭, ৯ মে ১৯৩০। বিয়ের স্থান ঢাকার রামমোহন লাইব্রেরি। সেই গরমের সন্ধ্যায় বিয়ের অনুষ্ঠানে আরও অনেকের সঙ্গে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত *কবিতা* পত্রিকার আরও আরও কবিবন্ধু।

বিয়েতে আপনাকে একটি আংটি দেয়া হয়েছিল কনেপক্ষ থেকে। সেটি নিয়ে আপনি খুব কুণ্ঠার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। লাবণ্যর বাবা-মা নেই, জেঠা তাঁর অভিভাবক, তাঁকে দিয়ে আবার টাকা খরচ করানো কেন! কেন, আংটি ছাড়া বিয়ে হয় না?

অন্যদিকে কিন্তু লাবণ্যদের চিন্তা, বিয়েতে শুধু আংটি দিলে চলে না, ঘড়ি, বোতাম, ফার্নিচার—কত কী দিতে হয়।

বরিশালে ফিরেই আপনি বললেন, 'এই, তোমরা আগে বলবে না, একটা আংটি গড়িয়ে নিয়ে যেতে হতো। লাবণ্যর জেঠামশাইকে শুধু শুধু টাকা খরচ করতে হলো। আচ্ছা, এই নিয়ম কোত্থেকে এসেছে বলো তো, বিয়েতে কিছু না-কিছু পেতেই হবে? এটা আমাদের কী ধরনের সমাজ?'

শুনে আপনার বড় পিসিমা হাসিমুখে বললেন, 'সমাজের দোহাই দিচ্ছিস কেন। তোরা না নিলেই পারিস। আমি তো দেখি বিয়ের সময় সব ছেলে বাবা-মার বাধ্য ছেলে হয়ে যায়, বাবা-মার কথার ওপরে কথা নাই,

ওনারা যা বলেন আর-কি!'

আপনি বউ নিয়ে স্টিমারে চেপে বরিশালে এসেছেন। শুরু হয়েছে আচার-অনুষ্ঠান। ধান-দূর্বা, মাথার চুল নিয়ে বিতিকিচ্ছি রকমের অনুষ্ঠান। পুরো পাড়া ভেঙে পড়েছে যেন এইখানে। বয়স্করা নানাভাবে আশীর্বাদ করছেন। আপনার চাদরের সঙ্গে লাবণ্য দাশের আঁচলের পাড়ে গেরো দেয়া। লাবণ্যর সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। লক্ষ্মীশ্রী স্তব আর স্তুতিতে নারীজনতা মুখরিত।

এই সব নারীশিশুবালিকার ভিড়ে এক কোণে শোভনাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। বউ দেখে তিনিও খুব খুশি। তার মিলুদার একটা ভালো বউ জুটুক, এটা সব সময়ই তিনি চেয়ে এসেছেন। তবে মিলুদা যদি বিয়ে না করতেন, তা হতো আলাদা কথা। কিন্তু শোভনা তো আর তাকে সত্যি সত্যি বিয়ে করতে পারতেন না। মিলুদা তাকে ভালোবাসেন, তিনিও মিলুদাকে ভালোবাসেন, কিন্তু মিলুদা বলেন প্রেম, শোভনা এটাকে ঠিক প্রেম বলে আখ্যায়িত করে না। মিলুদা কবিমানুষ, নানা কিছু কল্পনা করতে ভালোবাসেন।

তবে ত্রিশ বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। আর বিয়ে না করলেও পারতেন মিলুদা। সাংসারিক নন তিনি। ঘর-সংসার-বউ সামলাতে পারবেন কি আদৌ! শোভনা ভাবেন।

যাক, বিয়ে করে তিনি ঠকেননি। খুবই সুন্দর একটা বউ পেয়েছেন।

এই ভিড়ের মধ্যেও আপনি একবার তাকালেন শোভনার মুখের দিকে। না, কোনো ঈর্ষা নয়, এক ধরনের প্রসন্নতাই তো খেলা করছে শোভনার মুখে।

একসময় শাড়ির আঁচলের গিঁট থেকে মুক্ত হতে পারলেন আপনি। লাবণ্য তখনো নয়। এই ভিড় থেকে বাঁচার জন্যে এই নানা শরিকের ঘরের সবচেয়ে প্রত্যন্ত ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলেন। একটা বড় খাটের ওপর জাজিম পাতা, তার এক কোণে বসলেন।

ঠিকই একটু পর সেখানে শোভনা এসে হাজির।

সেও খাটের আরেক কোণে বসল।

আপনি বললেন, 'কী বিপদেই পড়েছিলাম, বলো তো!'

শোভনা বললেন, 'আমিও বুঝেছি, তোমার এই সব মেয়েলি আচার

ভালো লাগছে না! কিন্তু বিয়ের সময়ও তো নানা কিছু হয়। সেসব সহ্য করলে কী করে?'

'সে এক কেলেঙ্কারি! ভাগ্যিস তোমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো বলে যেতে পারলে না!'

'গেলে কী হতো? আমার না যাওয়াটা তুমি তোমার সৌভাগ্য ভাবলে মিলুদা?'

'তা নয় তো কী? আমি যে কাঠগড়ায় আসামির মতো দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে দর্শক হিসেবে তোমার না থাকাটাই তো ভালো।'

'কাঠগড়া?' শোভনা একটু আহত হয়ে আপনার দিকে তাকালেন!

'বরাবরই তো তোমাকে তা-ই বলেছি।'

'বিয়ের আগে সে একরকম তামাশা করেছ মিলুদা, কিন্তু এখন আর ও-রকম বোলো না।'

'তোমার কষ্ট হয়?'

'হয় বৈকি!'

'কার জন্যে?'

'আহা বউদি বেচারি! সে তো এসবের কিছুই জানে না, ওর মিষ্টি মুখখানার ভেতর না-আছে কোনো ঢঙ, না-আছে কারও দোষক্রটি ধরার কোনো ইচ্ছা। এমন ইনোসেন্ট মুখ আমি কখনো দেখিনি।'

'সত্যি বলছ?'

'আকাশ থেকে পড়লে যে!'

'তুমি তো জানো আমি কেবল বিয়ে করার জন্যেই করেছি। তোমাকে যাতে কেউ না দোষ দেয় সে জন্যেই। ওকে তো আর আমি ভালোবাসব বলে বিয়ে করিনি।'

'মিলুদা, এই সব কথা ভালো না। তুমি না বুঝে কথা বলছ। আগেও বলেছ, সেসব আমি তামাশা বলেই ধরে নিয়েছি। প্রথম রাতে না হয় না-ই হলো, তবু বলি, ওকে শেষ পর্যন্ত ভালো না বেসে তুমি পারবে না। এত সুন্দর একটা মেয়ে। একে ভালো না বেসে পারা যায়? এই, ওঠো তো! বউদি সেই স্টিমার করে এত দূর থেকে এসেছেন। কত ধকল গেছে। এখন কী সব চলছে। ওকে উদ্ধার করো।'

'আমি গেলেই কি আর ওরা ছাড়বে?'

'আমি যে কদিন আছি, বউদির ভার আমার ওপর।'

'কবে যাবে তুমি?'

'বৌভাতের পরের দিনই।'

'পরের দিনই!' লুণ্ঠিতসর্বস্বের মতো শোনাল আপনার গলা।

'তুমি এমন করছ। আগে জানলে আমি এই বিয়ে কিছুতেই হতে দিতাম না। এখন বউদির জন্যে কী রকম খারাপ লাগছে। ইনফ্যাক্ট বরযাত্রার দিন তোমাকে খুঁজেছিলামও। পেলাম না। সেদিন যদি পেতাম...'

'কী করতে। বিয়ে করতে নিষেধ করতে!'

'জানি না। মনে হয়!'

'ভালোই হয়েছে। আমাকে পাওনি। হয়তো আমার ভালোর জন্যেই এমন হয়েছে।'

'তোমার ভালোর জন্যে?'

'না, আমাদের দুজনের ভালোর জন্যেই। তুমি তো আর শেষ পর্যন্ত আমাকে বিয়ে করতে না।'

'তা করতাম না। বিয়েই করতাম না। তুমি করতে?'

'তোমাকে সাত-আট বছর ধরে যে-রকমটা দেখে এসেছি, তাতে ভেবেছিলাম, অন্তত দুঃখ পাবে তুমি। তাও তো পেলে না। কিন্তু তুমি আমার বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছিলে। প্রায় সবার জীবনেই প্রেম সার্থকতা পায় না। কিন্তু আমার জীবনে তা হয়েছে। প্রেমের কাছ থেকে আমার যা চাওয়ার ছিল, আজকে তা-ই পেলাম। হয়তো একটুক্ষণের জন্যে। তবুও তো পেলাম। আমি যা চাইছিলাম, সব পেয়েছি শোভনা। তুমি হয়তো একদিন ভালোবাসবে, অন্য মানুষকে ভালোবাসা দিতে পারবে, কিন্তু এই কষ্ট এই বেদনা এই মুহূর্তটুকুন এই অসহ্য ব্যথা এই অমৃত—এ আর কোনো দিন জীবনে পাবে না।'

শোভনার চোখে জল।

ততক্ষণে বাইরে বরখোঁজা হল্লা শোনা যায়। শোভনা নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর ছাড়েন। হল্লা চিৎকার উলুধ্বনি ভিড়ের তাপ গন্ধ এসে ঢেকে দেয় আপনাকে।

ফুলশয্যার রাতে লাবণ্যকে সত্যি সুন্দর লাগছিল। আপনি তাকে বললেন,

'আমি শুনেছি তুমি গাইতে পারো। একটা শোনাবে?'

বধূবেশী লাবণ্য জিজ্ঞেস করলেন মৃদুকণ্ঠে, 'কোন গানটা?'

আপনি বললেন, 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে...'

লাবণ্য বিস্মিত। এত গান থাকতে ইনি জীবনমরণের সীমা ছাড়াতে চাইছেন কেন?

গানটি জানা ছিল তাঁর। তিনি গাইতে লাগলেন :

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে ॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে ॥

নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে ॥

রবীন্দ্রসংগীতটি লাবণ্য গাইলেন দরদভরে। শেষ হলে আপনি তাকে অনুরোধ করলেন আরেকবার গাইতে। অনেক পরে লাবণ্য হাসতে হাসতে আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'ফুলশয্যার রাতে তুমি ওই গানটা কেন গাইতে বলেছিলে?' তখন আপনি হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া/তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া—এই লাইন দুটোর অর্থ বলো।' উভয়ে খানিকক্ষণ নীরব ছিলেন। তারপর আপনি বলেছিলেন, 'জীবনের শুভ আরম্ভেই তো এ গান গাওয়া উচিত ও শোনা উচিত।'



চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন

বৌভাত হলো ৩১ বৈশাখ, ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ) বরিশালের সর্বানন্দ ভবনে।

তারপর শুরু হলো আপনার বিবাহিত জীবন।

লাবণ্যর জন্য তৈরি করতে হলো একটা বাথরুম। বড়লোকের মেয়ে হয়তো সে নয়, কিন্তু বড়ঘরের বউঝিদের মতো করেই এত দিন সে মানুষ হয়েছে তার জেঠামশায়ের ঢাকার বাসায়, আর সে পড়াশোনার জন্য থেকেছে পাটনা আর ঢাকার ইডেন কলেজের হোস্টেলে। শ্বশুরবাড়ি একে তো পাড়াগাঁর মতো জায়গায়, তার ওপর ঘরদোরের যা শ্রী-চেহারা, খড়ের ছাউনি, দরমার বেড়া, সিমেন্টের ভিত নেই। লাবণ্যর মনে সব সময়ই একটা অশান্তি।

শেষে একটা পাকা বাথরুম করতে হলো। আর লাবণ্য বলল, এই রকম পাকা একটা বাংলো হলে ভালো হতো।

বাথরুমের চৌবাচ্চায় উড়ে ভারওয়ালা রোজ চার ভার করে জল দিয়ে যায়। প্রতিটি ভার চার পয়সা করে। পয়সার হিসাব আপনি করছেন না, বিয়ের পর পয়সার হিসাব কষতে হয় না। আপনিও ইদানীং আর তাই দিঘির ঘাটে আর যাচ্ছেন না নাইতে। ওই বাথরুমেই স্নান সারছেন।

লাবণ্য রোজই একটু গরগর করেন, 'পুরুষমানুষ আবার মেয়েদের স্নানের ঘরে যায় নাকি!'

'যায়।' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আপনি বলেন, 'বউয়ের স্নানের ঘরে যাওয়া চলে। স্বামী হওয়ার এই সুবিধাটুকুন আছে।'

'ঘেন্নায় মরে যাই। রাম্নো।'

'কিন্তু আমার কোনো ঘেন্না নেই। স্নানের ঘরের জানালা-কবাট বন্ধ করে নাইতে চির-আরাম। এমন আরাম আছে কে জানত।'

সুপুরি কাটতে কাটতে লাবণ্য বলেন, 'তুমি আবার পুরুষমানুষ নাকি একটা?'

'দেখে কী মনে হয়?'

'যাও, মেয়েমানুষের অধম কোথাকার?'

সকালে আজ আপনার চা খাওয়া হয়নি। দেরিতে উঠেছিলেন। বাড়ির সবাই ব্যস্ত। কাকে বলাই বা যায়। লাবণ্যকে বলা যাচ্ছে না, না, আপনি ভীরু নন, কিন্তু মেয়েদের ওই সব ফ্যানফ্যানানি, বিরক্তির সঙ্গে এক কেটলি এনে কাপে ঢালতে থাকবে, গনগন করতে থাকবে। সেই চায়ের কোনো স্বাদ থাকবে?

লাবণ্য চিরুনি থেকে চুল ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'তুমি আমার চিরুনি দিয়ে কেন আঁচড়ালে?'

'পরিষ্কার করে রেখেছি তো।'

'রোজই তোমাকে বলতে হয় আমার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ো না। আমার সাবান গায়ে মেখো না। অথচ রোজই তুমি তা-ই করছ। তোমাকে দিয়ে যে কী হবে, আমি বুঝি না।'

'তোমার সাবানে তোমার গায়ের গন্ধ লেগে থাকে। আমার বেশ লাগে।'

'কী বেয়াহা। ইতর অসভ্য এক নম্বর। মেয়েমানুষের গায়ের গন্ধ কথাটা বলতে আটকাল না একবারও?'

'আচ্ছা, তোমার চিরুনিতে আর আঁচড়াব না। তোমার সাবান গায়ে মাখব না। তোমাকে নতুন চিরুনি-সাবান কিনে দেব। কী বলো, লাবণ্য!'

তারপর লাবণ্যর মুখে হাসি। খুব মিহি করে সুপুরি কাটছেন তিনি। এগিয়ে ধরে বললেন, 'খাবে? আজ খাওনি, না। দাঁড়াও...'

১০-১৫ দিন পর। লাবণ্য ঢাকায় যাবেন জেঠামশায়ের বাড়িতে। শাশুড়ি তাঁকে বললেন, 'অল্প কদিনের জন্যে যাচ্ছ, ছোট বাক্সে সামান্য কিছু জামাকাপড় নাও। শীতের দিন তো নয়।'

কিন্তু নেওয়ার সময় তিনি কোনো কাপড়ই বাদ দিতে পারছিলেন না। শুধু মনে হচ্ছিল, এটা যদি লাগে, ওটা যদি লাগে। অথচ বাক্সে আঁটছেও না সব। দুবার-তিনবার চেষ্টা করলেন তিনি। তখন রাগ করে ধেত্তেরি ছাই বলে বাক্সটা উল্টে সবগুলো কাপড়চোপড় ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে পা চাপড়াতে চাপড়াতে উঠে গেলেন।

আপনি কাছে বসে সবই দেখছিলেন। আস্তে আস্তে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসলেন, শান্ত স্বরে বললেন, 'তুমি তো গোড়াতেই একটা ভুল করে বসে আছ। অল্প দিন থাকলে ওই ছোট বাক্সে কুলিয়ে যেত। তুমি না হয় বেশি দিনই থাকলে। থাকার ইচ্ছেটা তো তোমার। সেটা পরের কথায় কী করে হবে? যাও। একটা বড় বাক্স নিয়ে এসো।'

তখন লাবণ্যর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আপনাদের সর্বানন্দ ভবনে হানা দিল পুলিশ। তারা এসেছে লাবণ্যর খোঁজে। তাদের কাছে ইনফরমেশন আছে, লাবণ্যর সঙ্গে যোগ আছে সশস্ত্র বিপ্লবীদের। বাড়ি সার্চ করা হবে। আপনি বাড়ির বাইরের ঘরেই ছিলেন। আপনাকেই পুলিশ জিজ্ঞেস করল, 'লাবণ্য দাশগুপ্ত কার নাম?'

'আমার স্ত্রীর নাম।'

'তাঁর নামে ওয়ারেন্ট আছে। আপনি কয়েকজন ভদ্রলোক ডাকুন। আপনার ঘর সার্চ করা হবে।'

আপনি বললেন, 'আসুন।'

'ওনাকেও জেরা করতে হবে। ওনাকে ডাকুন।'

লাবণ্যও এলেন ঘরে।

আপনার ঘরে ঢুকে পড়ল পুলিশ। আপনি টেবিলে বসে আছেন। সামনে আপনার লেখার খাতা। পাশে একখানা *ঝরা পালক*। লাবণ্যও ঘরে আছেন। আর আছে পুলিশ কর্মকর্তা আর তার হাফপ্যান্ট পরা কনস্টেবলরা।

পুরো ঘর সার্চ করা হলো। খোঁজা হলো বিপ্লবী বইপত্র। আপনার বইপত্র, লেখার খাতায় বিপ্লবের গোপন আগুন খুঁজে খুঁজে হয়রান পুলিশ। একসময় পুলিশ কর্মকর্তা হাতে তুলে নিলেন *ঝরা পালক* বইটি। তার মুখে এক

ধরনের শ্রদ্ধার আলো যেন ফুটে উঠল। তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেল একটামাত্র বিপ্লবী বই, *আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবের ইতিহাস।*

পুলিশ কর্মকর্তা কবিকে বললেন, 'দেখুন, আপনার স্ত্রী রীতিমতো বিপ্লববাদীদের দলে যোগ দিয়েছেন।'

আপনি খানিকটা বিমর্ষমুখে বললেন, 'আমার স্ত্রীর বিপ্লবের সাথে কোনো যোগ নেই।'

'মশাই, এরা ঢাকার মেয়ে। এদের কতটুকু আপনি চেনেন?' গর্বভরে লাঠি দোলাতে দোলাতে বললেন কর্মকর্তা।

পুলিশ কর্মকর্তা বইটা লাবণ্যর দিকে তুলে ধরে বললেন, 'এই বই কি আপনার?'

লাবণ্য বললেন, 'হ্যাঁ।'

'এরপর আর কী বলার থাকে আপনার।' বলেই তিনি এক হাতে ওয়ারেন্ট, অন্য হাতে কলম ধরলেন।

লাবণ্য গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, 'বলবার কথা এইটুকু যে, ওখানা বিএ ক্লাসে ইতিহাসের রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করানো হয়। ইচ্ছা করলেই আপনি বিএম কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

'বিএ ক্লাসের বই আপনার কাছে কেন। আপনি তো পড়েন আইএ। আর এত রকম গল্পের বই থাকতে বিপ্লবের বই পড়েন কেন?'

লাবণ্য হেসে ফেললেন। বললেন, 'আইএতে আমার ইতিহাস আছে। তা ছাড়া ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসও বাংলার ছেলেমেয়েকে পড়তে হয় বলেই জানি। তবে আপনি যদি সঠিক খবর চান, তাহলে অবিশ্যি ইতিহাসের অধ্যাপককে ডেকে আনতে হয়।'

লাবণ্যর কথা শুনে কর্মকর্তা অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর মুখ থমথমে।

আপনি তখন আপনার সেই বিখ্যাত হাসিটায় ফেটে পড়লেন, ওহে আর কেন, অনেকভাবেই তো পরীক্ষা করলে। এবারে নিল লিখে দিয়ে উঠে পড়ো।

চলে যাওয়ার সময় কর্মকর্তা আগ্রহভরে *ঝরা পালক* কবিতার বইটি চেয়ে নিয়ে গেলেন।

বাড়িতে একটা কলরবমতো উঠল। কিন্তু আপনি রইলেন শান্ত।

লাবণ্যকে বললেন, 'তুমি বড় হয়েছ, তোমার যা ভালো মনে হয় তা করবে, আমি তাতে বাধা দেব না। দেশের কথা ভাবতে চাইলে, দেশের জন্যে কাজ করতে চাইলে, আমি বাধা দেব কেন।'

লাবণ্যর শৈশব কেটেছে ছোট নাগপুরের গিরিডিতে। শালবনের আলো-আঁধারি ছায়াভরা পথে পথে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি ভয়বাধাহীন, এক ঝরনা থেকে আরেক ঝরনায়, পাহাড়ি নদীর খাড়া বাঁকে, বন্ধনহীন ছিল তার চলাচল। হোস্টেলের মেয়ে, একটু স্বাধীনচেতা। ঢাকাতেও যোগ স্বদেশিদের সঙ্গে। এই মেয়ে বরিশালের ছোট শহরের বড় সামাজিকতার বন্ধনের ভেতর এসে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন। এটা কোরো না, ওটা করতে নেই শুনতে শুনতে তাঁর অস্থিরমতো লাগত। তিনি মাথার চুল ছিঁড়তেন, কাঁদতে বসতেন।

আপনি তাঁকে বললেন, 'তুমি চোখের জল ফেলো না, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যেদিন বরিশালের এই আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারব, আমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমাকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেয়া। আজ তুমি যতটা কষ্ট সহ্য করছ, ভবিষ্যতে ঠিক সেই পরিমাণেই স্বাধীনভাবে তুমি চলতে পারবে। তখন কেউ যদি তোমাকে বাধা দিতে আসে, সেই বোঝাপড়া হবে আমার সঙ্গে।'

লাবণ্যর সঙ্গে কুসুমকুমারী দেবীর খিটিমিটি লেগেই থাকত। শাশুড়ি রাগ করে কিছু বললে লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন মুখের ওপর। কথা-কাটাকাটি হতো। রাতে হয়তো এই রকম একপশলা হয়ে গেছে, কিন্তু ভোরবেলা আপনার মা ঠিকই বউয়ের জন্যে গরম চায়ের পেয়ালা হাতে দরজায় দাঁড়াতেন।

যে রাতে বেশি মনোমালিন্য ঝগড়াঝাঁটি হতো, পরের দিন কুসুমকুমারী বউমাকে আরও বেশি আদর করতেন। নতুন নতুন রান্না রেঁধে খাওয়াতেন বউকে।

প্রথম প্রথম আপনি বউ-শাশুড়ির ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করতেন। পরের দিকে আর করেননি। বরং ঝগড়া করে লাবণ্য যখন গম্ভীর হয়ে বসে আছেন ঘরে, আপনি বলতেন, 'কালকে আবার কী নতুন খাবার রান্না হচ্ছে। আমার নিজের মা। কিন্তু ভালোমন্দ খাওয়ার কপাল করে তো আমি আসিনি। তুমিই তো...'

লাবণ্য 'ও মা, দেখুন তো' করে ঝাঁঝিয়ে উঠতেই আপনি সটকে পড়তেন অকুস্থল থেকে।

বিয়ের পর আপনি আর দিল্লি ফিরে গেলেন না। বাংলার বাইরে কোথাও যেতে আপনার ইচ্ছে করে না। আপনার তার চেয়ে বরিশালই ভালো। কিন্তু গেলেই যে ওখানকার চাকরিটা আপনি আবার ফিরে পেতেন তাও নয়। বরিশালে থেকে কিছু একটা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আবার একবার কলকাতা একবার বরিশাল করতে লাগলেন। এরই মধ্যে বিয়ে করে ফেলেছেন, হাতে তো টাকাপয়সা দরকার, বসে বসে আর কত খাবেন।



আমি ক্লান্ত প্রাণ এক

বাবাও আপনাকে বলেন, 'কলকাতা গিয়ে ভালোমতো চেষ্টা করে দেখো।' বৃথাই আপনি টিনের স্যুটকেস, রংচটা একটা বিছানা, মানিব্যাগে তিন টাকা সাড়ে ন পয়সা নিয়ে যেতেন কলকাতায়। থাকতেন মেসে। খুঁজতেন চাকরি। মেসের জীবন্মৃত অবস্থায় থেকে যেকোনো একটা চাকরি জোগাড়ের মর্মান্তিক চেষ্টা। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, ইনকাম ট্যাক্স বিল্ডিং, ক্যালকাটা করপোরেশন, ইন্স্যুরেন্স অফিসগুলো—একেকটা জায়গায় ১৫-২০ বার করে ধরনা দিয়েছেন। যেকোনো একটা স্কুলের ২৫ টাকার মাস্টারি, ইন্স্যুরেন্সের দালালি, ক্যানভাসারি, স্টেনোগ্রাফার, শেয়ারবিক্রেতা, এমনকি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছেন, অবস্থা এ রকম হয়ে পড়েছিল, যেকোনো উপায়ে জেলে যাওয়ার ফন্দিফিকিরও করেছেন। দেশের বাড়িতে মনোহারি দোকান করার কথা ভেবেছেন, সামান্য একটা চামার মরলেও দু শ গ্র্যাজুয়েট দরখাস্ত নিয়ে ছুটে আসে, সামান্য একটা টিউশনি পাওয়ার জন্যে কাঠপিঁপড়ের মতো দেখেছেন মানুষের জঙ্গল। রাতের বেলা মেসে ফিরে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভেতর মেসের বিছানায় শুয়ে প্রতিবার আপনার মনে হয়েছে, এই রাত যেন শেষ না হয়, নির্লজ্জের মতো সকাল যেন না আসে, কুকুরের মতো জিভ বের করে একটা চাকরির খোঁজে আপনাকে যেন বেরোতে না হয়।

আপনার মেয়ে জন্ম নিল বিয়ের বছর ঘোরার আগেই। আর এরই মধ্যে আপনি কলকাতা শহরে পেয়ে গেছেন তাকে, যাকে আপনি ভাবছেন যে আপনি আসলে ভালোবাসেন। নিজের মেয়েটাকে কেউ কেউ ভাবত, আপনার ডায়েরির গুপ্তলিপি উদ্ধার করলে দাঁড়ায়, ভালোবাসাহীনতার সন্তান।

কিন্তু আপনি ভালোবাসতেন ঠিকই খুকিকে। প্রতিবছর খুকিকে ফেলে আসার আগে কী মনে হতো আপনার, সেটা আছে আপনারই লেখায়–

ধীরে-ধীরে খুকিকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেলাম আমি।

বিছানায় আমার পাশে শুইয়ে মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম চোখ চেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

— 'তুই জেগে আছিস যে রে?'

— 'বিত্তি'

— 'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম, কেমন লাগে?'

— 'বাবা।'

— 'কী মা?'

— 'মিছছি কোথায়?'

— 'মিছরি?'

— 'মিছছি খাব।'

— 'এখন খায় না মা।'

— 'বোতলে আছে।'

— 'হ্যাঁ।'

— 'খাব।'

— 'কাল সকালে খেও।'

— 'মিছছি খাব।'

— 'সকালবেলা দেব কাল।'

— 'বাবা।'

— 'কী মা?'

— 'মিছছি খাব।'

একটু চুপ থেকে–'মিছরি খেলে পিঁপড়ে কামড়ায়।'

জীবনীশক্তি ঢের কম; পিঁপড়ের কথা শুনে নিস্তব্ধ হল।

মাথায় হাত বুলতে-বুলতে— 'তোমার নাম কী খুকু?'

মনের অবসাদে সহসা কোনো জবাব দিল না।

— 'কী নাম তোমার?'

অন্ধকারের ভিতর দু-তিনটে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে-ধীরে— 'আমাল

নাম?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কুকুলানি।'

এমন নিরপরাধ, এমন মিষ্টি অথচ এমন মর্মস্পর্শী।

অন্ধকারের ভিতর আমার চোখের জল দেখল না মেয়েটি। ধীরে-ধীরে বললাম— 'খুকুরাণী।'

— 'কী?'

— 'তুমি কাকে ভালবাস?'

— 'দাদুকে।'

— 'আর কাকে?'

— 'ঠাকুনকে।'

— 'আর কাকে?'

একটু চুপ থেকে— 'বাবাকে।'

— 'বাবা কোথায়?'

অন্ধকারের ভিতর কচি-কচি হাত আমার চোখ-নাকের উপর বুলিয়ে দিয়ে, 'এই যে বাবা।'

— 'মাকে ভালবাস না?'

— 'দাদুকে ভালবাসি।'

— 'মাকে?'

— 'দাদুকে ভালোবাসি।'

— 'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'

— 'না, নিয়ে যাবে না।'

শীর্ণকণ্ঠে উত্তেজনার আওয়াজ বেজে উঠল, 'নিয়ে যাবে না শেয়ালে।' সন্ত্রস্ত হয়ে বললে–'বাবা–'

— 'কী?'

— 'মাকে শেয়ালে নিয়ে যাবে না?'

— 'না।'

— 'মাকে ভালবাসি যে আমি।'

— 'বেশ।'

— 'রাম্নুকে শেয়ালে নিয়ে যাবে।'

— 'রামু কে?'

উদ্ধত হয়ে— 'নিয়ে যাবে শেয়ালে রামুকে।'

একটু ভেবে— 'নন্দুকে নিয়ে যাবে।'

আর একটু ভেবে— 'বুলুকে নিয়ে যাবে।'

শিশুর মনের এই অন্ধকার স্রোত ফিরিয়ে দেবার জন্য— 'না, কাউকে নিয়ে যাবে না রে।'

— 'নেবে না?'

— 'না, শেয়াল নেই।'

— 'নেই?'

নিস্তব্ধভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করতে লাগল সে।

গায় হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম।

বললাম— 'তোমার জুতো কই খুকুরাণী?'

— 'নেই?'

— 'বাবা কিনে দেয়নি?'

— 'না।'

— 'খালি পায় মাটিতে হাঁটো?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'ঠাণ্ডা লাগে যে?'

— 'আমার বোতল ভেঙে গেছে।'

— 'কিসের বোতল?'

— 'দুধের। দাদু কিনে দেবে আবাল।'

— 'জুতো কে কিনে দেবে?'

— 'দাদু।'

— 'তাই তো, দাদু তোমার জীবনের বড় মূল্যবান জিনিস। যখন বড় হয়ে উঠবে তুমি, না থাকবে দাদু, না থাকবে ঠাকুমা, তখন কী করবে তুমি?'

মেয়েটি প্যাট-প্যাট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, খানিক যেন বুঝেছে, খানিক বোঝে নি। ভবিতব্যতার অন্ধকারে ঘেরা এই পৃথিবীর পথে চলতে-চলতে এক-একটা ইঁদুরের ছানার অবস্থা মাঝে-মাঝে যে-রকম হয়—তেমনি হয়েছে এই মেয়েটির।

— 'খুকু, একটা ছড়া শুনবে?'

— 'ছড়া কী?'
— 'কবিতা।'
— 'কোপাতা কী?'
— 'শোনো।'
— 'খুকুরাণী-খুকুরাণী অন্ধকার রাতে'
— 'বাবা।'
— 'কী মা?'
— 'আবার বলো— '
— 'আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে বলো— খুকুরাণী-খুকুরাণী, বলো'
— 'কুকুলানি-কুকুলানি'
— 'অন্ধকার রাতে'
— 'অন্ধকার লাতে'
— 'অনেক কথা বলেছিস— এখন ঘুমো।'
— 'জল খাব বাবা।'
একটু জল গড়িয়ে এনে দিলাম।
গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম উষ্ণতা আরো বেড়েছে যেন।
— 'খুকু।'
— 'উঁ?'
— 'ব্যথা করে?'
— 'বেথা কোলে।'
— 'কোথায়?'
— 'বাতাস দাও।'
বাতাস দিতে-দিতে— 'খুকুরাণী।'
— 'উঁ?'
— 'আমি কলকাতায় চলে যাব যে— '
আমার গলা জড়িয়ে ধরে— 'না।'
— 'তুমি দাদুর কাছে থাকবে— '
— 'না, দাদুকে শেয়ালে খেয়ে ফেলেছে।'
একটু হেসে— 'তা হলে ঠাকুরমার কাছে থাকবি।'
— 'উঁহু না— ঠাকুনকে শেয়ালে নিয়ে গেছে যে।'

— 'মার কাছে থাকবি।'

উৎপীড়িত হয়ে— 'না, থাকব না।'

— 'মিছরি দেবে যে মা, দেবে, লবেনচুশ দেবে, বিস্কুট দেবে।'

লুব্ধ চোখ অন্ধকারের ভিতর ঘুরতে লাগল।

— 'আমি কলকাতায় চলে গেলে মা তোমাকে মিছরি দেবে, লজেন পাবি, বিস্কুট পাবি।'

— 'বিসকুট!'

— 'থাকবি?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'কার কাছে?'

— 'মার কাছে।'

— 'আমি কলকাতায় চলে যাব যে।'

— 'হ্যাঁ, তুমি চলে যাবে।'

— 'আর আসব না।'

মাথা নেড়ে বললে— 'না, আর আসবে না।'

দেখলাম মুখের ভিতর কোনো ভাব পরিবর্তন নেই।

কলকাতায় যাওয়া যে কী, যাওয়া-আসারই বা কী মানে, তা বুঝবার মতো বোধ এখনো হয় নি।

— 'আর আসব না যে খুকি।'

— 'না— '

— 'কলকাতায় চলে যাব, আর আসব না— '

মাথা নেড়ে— 'না আসবে না। দাদু আছে, ঠাকুন আছে, মা আছে, ভুলু আছে, রবি আছে, খোকন আছে।'

— 'আর বাবা?'

— 'রবি, ভুলু, খোকন, মিনু আছে, খেলা করবে।'

আজকের জন্য এর এই রকম ভবিষ্যতে এমনি কোনো ভবিতব্যতার বেদনায় কিংবা সফলতার শান্তিতে হারিয়ে যাবে তুমি—কোলাহলে-কোলাহলে দূরের থেকে দূরে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলব, আমাকে হারিয়ে ফেলবে তুমি—হয় ত পলক ফেলতেই দেখব, জীবনে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, পরের ঘরে চলে গেছ, দূরের বন্ধু হয়েছ, বছরের পর

বছর ঘুরে গেলেও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। তাগিদও বোধ কর না, তুমিও না, আমিও না। আজও তুমি রবির কথাটা বল, খুকুরাণী।

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল।

খুকি ঘুমিয়ে গেছে, মশারির চালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে।

কলকাতায় চাকুরির সন্ধানে গিয়ে মেসের নিঃসঙ্গ গ্লানিময় দিনগুলো কেমন ছিল, তা আমরা পাব *কারুবাসনা* গল্পে।

কারুবাসনার গল্পটা তো আপনি লিখেছিলেন আত্মকথনের ঢঙে। নায়ক নিজের গল্প শোনাচ্ছে। তার বয়স আপনার সমান। সেও আপনার মতো এমএ পাস করে বসে আছে বেকার। তারও মাথায় আপনার মতো কবিতার দংশন তথা কারুবাসনার বিস্তার। সেও আপনার মতো বিয়ে করেছে, খুকির বাবা হয়েছে। সেও আপনার মতো মাঝে-মধ্যে কলকাতা যায় চাকরির খোঁজে। তাতেই আমাদের ধন্দ জাগে, কারুবাসনা কি বানিয়ে তোলা কল্পকাহিনী, নাকি আপনারই আত্মজীবনী মাত্র। অন্তত আপনারই নিজের সঙ্গে বলা নিজের কথাগুলো।

কারুবাসনার ওই কবিও আপনার মতো ধানসিঁড়ি নদীর মতো কোনো নদীর তীরেই থেকে যেতে চায়। সে যেতে চায় না শহরে, কলকাতায়। চাকরির খোঁজে মাথার ঘিলু রোদে শুকিয়ে আরেকবার ব্যর্থ হয়ে ফিরতে চায় না। মাকে সে বলে, 'মেসে গিয়ে প্রথম দিকটা বড্ড খারাপ লাগে, মা। গিয়ে পৌঁছই একেবারে দুপুরবেলা, মানুষজন নেই, এমন খাঁ খাঁ করতে থাকে, খুকির জন্য বড্ড কষ্ট লাগে।'

মা কিছু একটা বলেন, আপনার গোপন অপ্রকাশ্য উপন্যাস-মুসাবিদায় মায়ের উক্তিটির জন্যে জায়গা রেখে দেয়া। আমরা এখন সেটা পূরণ করে নিয়ে গল্পটা বলে যাই। যেন আপনার সঙ্গেই কথা হচ্ছে কুসুমকুমারী দেবীর।

মা বলেন, 'খুকির কথা তো মনে হবেই।'

—তোমার কথা মনে হয়, বাবার কথা মনে হয়, অবাক হয়ে ভাবি, তোমাদের সাথে কোনো দিন দেখা হবে কি না।

—দেখা হবে না কেন?

—নিচে নেমে দেখি চৌবাচ্চা শূন্য; খানিকটা ঠান্ডা ভাত, পুঁইয়ের চচ্চড়ি আর ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়ে খেয়ে, ওপরে চলে এসে, পথের ধুলো-কাল-মাখা বিছানাটা পাতি। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করি, কিন্তু সাধ্য নেই—ঝটফট করে উঠে বসতে হয়।

—তারপর কী করো?

—বিছানায় উঠে বসে ফুটপাতের ওপাশে মস্ত তেতলা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি—দেখি আকাশপ্রদীপ দেয়া শিকের ওপর একটা চিল বসে আছে, কতগুলো পায়রা; ছাদে তারের ওপর চওড়া লাল পাড়ের, কস্তা কালো পাড়ের কতগুলো শাড়ি শুকোচ্ছে—একঝলক শান্ত নিরিবিলি ঘরকন্নার গন্ধ আসে; বেশ লাগে!

—তুমি তো দেখছি বড় নস্টালজিক আছ খোকা!

—চেয়ে দেখি একজন বর্ষীয়সী মহিলা ভিজে চুলে সিন্দুর মাথায় লুচি ভাজবার ঝাঁঝারি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কিংবা একজন তরুণী স্নান খাওয়ার পর পান চিবুতে চিবুতে...

—এই সব দেখো। বাড়ির কথা খুব মনে করো!

—মেসের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না আমি আর। চাকরটাকে দু পয়সা বকশিশ দিই—বলি, রাস্তার কলে এক বালতি জল তুলে আনতে। তাই দিয়ে স্নান করে পথে বেরিয়ে পড়ি।

—কোথায় যাও?

—দুপুরবেলা কোথায় আর যাব? সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই সাত বছর ধরে গিয়ে দেখে এসেছি। ওয়াইএমসিতে গিয়ে কাগজ পড়ি। রেইনট্রি গাছের নিচে গোলদিঘির বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। আকাশ, মেঘ, দিঘির জল, চারপাশের ফুলের কেয়ারি, দেবদারু ডালপালার দিকে তাকাই। মনে হয় পৃথিবীটা সুন্দর ছিল, মানবজীবনের সম্ভাবনাও ছিল চমৎকার। এত সহজে বসে উপলব্ধি উপভোগ করছি এ তো ঢের, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে মাছির মতো মনে হবে; অন্ধকারের মধ্যে একটা অন্ধ গুবরে পোকার যতখানি নিস্তার, তার চেয়ে একটুও বেশি পথরেখা দেখবার উপায় থাকবে না।

—ওইখানে ওইভাবে কতক্ষণ বসে থাক, বাবা?

—কয়েক মিনিট বসে থাকতে থাকতে জীবনটা কেমন ছটফট করে ওঠে, আবার বেঞ্চির থেকে উঠে গিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াই। রাস্তা পেরোতে

গিয়ে দেখি একটা বাস আরেকটু হলেই আমাকে গিলে ফেলেছিল আর কি!

—কলকাতার পথে খুব সাবধানে চলতে হয়!

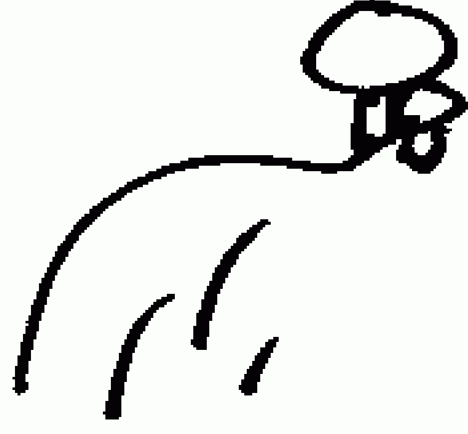
—হ্যাঁ, সাবধানে বরাবর চলি। তবে মাঝে মধ্যে মনটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।

—বাসের ধাক্কা খেলে তো আর রক্ষা নেই।

—অবিশ্যি আশঙ্কাটা খুব কম।

—ফুটপাত দিয়ে চলো।

হা! আপনার মা/খোকার মা-আপনাকে/খোকাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলেন, আপনিও সাবধানেই পথ চলতেন, কিন্তু অন্যমনস্কতাটাও তো আপনার জাতসঙ্গী, পূর্বপুরুষদের সন্নিহিত পরীরা আপনাকে দিয়েছে অপার্থিব ডানা, অন্যমনস্কতা তাই আপনার ছায়ারই মতন, আপনাকে তাই খেয়ে ফেলল একদিন। ভাগ্যিস মা আপনার তারও আগে মারা গেছেন, না হলে আপনার দুর্ঘটনার খবরটা তিনি কীভাবে যে নিতেন...!



পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে ...

লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে আপনার দাম্পত্যটা খুব সুখের যে হয়নি, সেটা নানাভাবে বোঝা যায়। লাবণ্যকে আমরা দোষ দেব না, তিনি ছিলেন পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য অন্বেষী একজন গদ্যের নারী। ঢাকার জীবন থেকে বরিশালের গোলপাতা ছাওয়া ঘরে যেমন খাপ খাইয়ে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, তেমনি কলকাতার সংসারটা, যাকে বাস্তবিক অর্থে সংসার সামলানো বলে, তিনি দু হাতে একাই সামলেছিলেন। ওই দারিদ্র্যপীড়িত দিনগুলোতে যতটুকু পারা যায় সংসারটাকে পরিপাটি করে রাখতেন তিনিই। বিয়ের পর পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন, বিএ পাস করেছেন, শেষতক শিক্ষকতার চাকরি করেছেন কলকাতার জীবনে। তাকে তো ঠিক সাধারণ নারীও বলা যাবে না। ঢাকায় সম্পর্ক ছিল স্বদেশিদের সঙ্গে, বরিশালের ব্রাহ্মবাড়ির শীতল শান্তস্নিগ্ধ আটপৌরে কিন্তু আঁটসাঁট জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া অসম্ভবই ছিল প্রায়।

অন্যদিকে আপনার হৃদয়ে গভীর গভীরতর অসুখ। আপনি তো শোভনাকে ভোলেননি, কৈশোরে দেখা কোনো উজ্জ্বল মুখও দীর্ঘদিন নিজের ভেতরে নিজেই প্রজ্বলিত করে রেখেছেন। আপনার প্রায় নিষিদ্ধ গোপন লেখাগুলো, ডায়েরি, গল্প, উপন্যাস—সেসব তো ছিল এক রহস্যময় নিজস্ব জগৎ। তার ভেতরে তো অন্য কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। সেখানে আমরা দেখতে পাই অন্য নারীর জন্যে হাহাকার। কাজেই দরজা কেবল লাবণ্য দাশের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, তাই নয়, আপনার নিজের চারদিকেও তো আপনি দুর্ভেদ্য দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। তারপর নিজের ভেতরে নিজে, আপনি বাস করতে থাকেন একদম আটকে ফেলা দুঃসহ

একাকিত্বময় জীবনে। আপনার নিজের চেহারা নিয়ে আপনি কুণ্ঠিত ছিলেন। আপনার চাকরি ছিল না জীবনের বহু বছর, আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, একটা পয়সার জন্যেও আপনাকে কষ্ট করতে হয়েছে, এই রকম দিন গেছে বহু, এসবও হয়তো দিনের পর দিন আপনার সঙ্গে লাবণ্যর দূরত্ব রচনা করে গেছে।

সেই দূরত্ব কতটা দুস্তর হয়ে পড়েছিল?

আপনার ঘনিষ্ঠজন বিরাম মুখোপাধ্যায়কে আপনি বলেছিলেন, "যদি স্ত্রী আপনার আমন্ত্রণে ঘনিষ্ঠ হবার প্রস্তাবে সায় না দেয়, কী করবেন? কী করা উচিত?"

অন্যদিকে আপনি ভাবতেন, আপনার যৌন-তাড়না বেশি, এর একটা গোপন কারণ আছে। তা হলো কোনো স্বাস্থ্যগত কারণে আপনার সারকামসিশন হয়ে গেছে, যদিও ড. অমল ঘোষের মতো একজন দুজন ছাড়া এটা কেউ জানতেন না, আর যারা জানতেন তারাও ভুলে গেছেন বলে আপনি মনে করতেন, তবুও, আপনার ধারণা ছিল, ত্বকচ্ছেদের কারণে দৈহিক কামনা ও আনন্দ দুটোই বেড়ে যায়। আবার আপনি এও ভেবেছিলেন, শারীরিকভাবে কথাটা ঠিক হলেও আত্মিক দিক থেকে ঠিক নয়, আপনি দৃষ্টিভঙ্গি, কল্পনাপ্রতিভা ও কাব্যের ঐতিহ্য পেয়েছেন আপনার পূর্বসূরি, প্রকৃতি, সময় আর রহস্যালোক থেকে।

আপনি যে ওয়াই চিহ্নিত মেয়েটির প্রতি দুর্বল, এটা লাবণ্য জানতেন। আপনিও ঈর্ষা করতেন তার প্রাক্তন বন্ধুদের, অন্তত চারজনকে। আপনার দিনলিপি বা সাহিত্যিক নোটে আপনি লিখেছেন, "Premarriage days recalled—as if they could court, love & marry again after all these dissillusionments-Even jealousies recalled (Her to Y, mine to 4)", "বিবাহপূর্ব দিনগুলো মনে পড়ছে, যেন তারা আবার পরিণয়-প্রার্থনা করতে পারবে, ভালোবাসবে এবং এত মোহভঙ্গের পর আবার বিয়ে করতে পারবে—এমনকি ঈর্ষা ফিরে আসছে (ও ঈর্ষা করে ওয়াইকে আর আমি ৪ জনকে)"। আপনার ডায়েরি ও লিটেরারি নোটস থেকে লাবণ্যর এই রকম ঢাকার বন্ধুদের নাম পাওয়া যায়, অরুণ ও সুজয় বিশেষভাবে, আরও আছে বীরেন, প্রদোষ, সন্তোষ, সোনা এবং অতুল। এদের নিয়ে আপনি ঠাট্টা-কটুকাটব্য কম করেননি লাবণ্যর সঙ্গে। সুজয়ের কারণেই আপনার মনে

একটা ঢাকা-ফোবিয়া তৈরি হয়েছিল, লাবণ্য যে একা একা ঢাকা চলে যেতেন, সেটা আপনি ভালো চোখে দেখতেন না। ফলে দাম্পত্যে শীতলতা আসবার নানা উপলক্ষও প্রস্তুত ছিল আপনাদের।

১৯৩১-এর আগস্ট। আপনি এখন কলকাতার মেসে। 'বাসাড়ে মানুষ আবার মানুষ!' 'এই দেখুন ঘরের সামনে মুতে দিয়েছে।' 'যাকে রাখ সেই রাখে।' এই সব কথাবার্তা ভেসে আসছে। আর এখানে-সেখানে স্তূপ হয়ে আছে সিগারেটের কেস, দেশলাইয়ের বাক্স। মেসের সহবাসীদের খিস্তিখেউড়। কারও বা অসুখ। কারও নাকডাকার শব্দে উচ্চকিত দুপুর। পকেট কপর্দকশূন্য। শুধু ঢেঁড়স খেয়ে দিন যাচ্ছে আপনার, এটাকে আপনি একই সঙ্গে পরিহাস আর সৌন্দর্য বলে মানছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন চাঁদ, আর মেঘ, আর পকেটে পয়সা নেই, কোনো পদ নেই, কোনো সুযোগ নেই, কোনো দরজা নেই, নেই কোনো সহানুভূতি। কেবল কলকাতার রাস্তায় আছে বুড়ো কালো ষাঁড়, বাসের ছুটে চলা, গাড়ির গাড়লের মতো কেশে ওঠা, সাইকেল আর মানুষ, কিন্তু সবকিছু কেমন নিজ নিজ জায়গাটা জুড়ে চলছে, চমৎকার এঁটে গেছে যা হোক!

শরতের সকালগুলো, এই কলকাতাতেও, সত্যি সুন্দর লাগে আপনার। অপরূপ আকাশ, চমৎকার নীলিমা, এই মাটি, জল আর আলো—সব আপনাকে মনে করিয়ে দেয় আপনার সেই কিশোরবেলা, যখন দু চোখ ভরা ছিল ছিল আশা আর স্বপ্ন। আহা, সেই বাংলাকে ছেড়ে আসার দুঃখ আবার আপনার মনে বাজে। সেই গ্রাম্য পথে কি আরেকবার হাঁটা হবে না?

দুপুরে আপনার দরজা খোলা। বাইরের অপরূপ দুপুর দরজা খোলা পেয়ে মধুর বাতাস হয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। আপনার দু চোখে দিবাস্বপ্ন। এই পৃথিবীতে মানুষ বড় একা, নির্বাসিত, অসহায়। কবিরাই পারেন তাদের অবলম্বন তৈরি করতে। কবিতা আর শিল্পই তো অসহায় নিঃসঙ্গ মানুষের সহায়। এই দুঃখ-কষ্ট, উদ্বেগ-হতাশা, গ্লানি-ব্যর্থতা ভরা পৃথিবীতে কবিদের তৈরি স্বপ্নজগৎই পারে মানুষকে শরণ দিতে। আজ আপনার দিবাস্বপ্ন হলো, আপনি লিখছেন আপনার দিনলিপিতে–গ্রামবাংলার প্রান্তর, ধানসিড়ির তীরে ফসলের ক্ষেত, হলুদ শস্য, হেমন্তের সকাল আর দুপুর আর সঙ্গে এক বালিকা, যে আপনাকে চেনে বহু বছর ধরে, এমন একজনকে জানা আর বোঝা আর তারিফ করতে পারা বহু প্রেম ভালোবাসার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

বুঝি সেই রকম একটা মেয়েকেই আপনি দেখেছেন। স্কট'স লেনে সকাল বেলা, তার চোখ দুটো দেখে মনে হলো বুঝি সে বুঝতে পারে আর প্রশংসা করতে জানে। কিন্তু এই সব আকাশকুসুম চয়নের দিন তো আপনার নয়। এর ওর দ্বারে আপনাকে ঘুরতে হচ্ছে কাজের খোঁজে। পকেটে পয়সা নেই। দিনে ছয় পয়সার বেশি খরচা করবেন না—এই হলো আপনার পণ। জিতু আর অমিয় নামের দু অধ্যাপকের কাছে যাওয়ার কথা চাকরির আশায়। না, আজ রাতে আর যাবেন না। দিনে একবার গিয়ে পাননি তাদের। মেসের ঘরেই মনের জানালা খুলে বসেন। একবার মনে হয়, কলকাতাটা যদি হতো ব্যাবিলন, যদি আকাশে থাকত শাদা মেঘ, রাতের আকাশ হতো ঘননীল। পরের মুহূর্তে মনে হয়, ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন ঋদ্ধ প্রকৃতি, সেখানেই মানুষ খুঁজে পেতে পারে অনন্ত বিচিত্র সৌন্দর্য, যা যা সে পেতে চায়।

তারপর ভাবনা আসে, ঈশ্বর পুরুষ মানুষকে দিয়েছেন খুব বেশি সংখ্যক শুক্রাণু, আর অনেক বেশি যৌন-আকাঙ্ক্ষা, মানুষ তার পরিবারিক বন্ধন কীভাবে বজায় রাখবে, এই নিয়েই সভ্যতার যত বিয়োগান্তক ঘটনা, যত প্রতিযোগিতা। কিন্তু একজন সৃজনশীল বা আধ্যাত্মিক মানুষের স্থান এর মধ্যে কোথায়?

রাতের ঘননীল আকাশ আর শাদা মেঘ দেখে আপনার এইসব কথা মনে পড়ে।

কিছুদিন আগে শোভনার জন্মদিন গেছে, আগস্টের ৩ তারিখ তার জন্মদিন। না, যাননি আপনি শোভনাদের ওখানে। চাকরি নেই, বাকরি নেই, পকেটে খরচ করবার মতো একটা অতিরিক্ত পয়সা নেই, কী হবে গিয়ে। তবু একদিন ফোন করে বসলেন। জন্মদিন বিষয়ে তিনি কিছুই বললেন না। আপনিও কিছু বললেন না। আজ আর আপনার শোভনাও আপনাকে উত্তেজিত আহত মগ্ন করতে পারে না। কোথায়ই বা গেল আপনার কাব্যচর্চা, কোথায় রোমান্টিকতা? কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের কেন কাজের সন্ধান করতে হবে? সিটি কলেজের চাকরি বা শিলংয়ে অবাঙালি এলাকায় চাকরি করে কি বাগদেবীর সেবা করা যায়?

এইভাবে শক্তি আর উদ্যমের অপচয় আর কত? আবার মনে পড়ে পথের ধারে হাত পেতে বসে থাকা কুষ্ঠরোগীর মুখ। আপনি যে কোনোদিনও এদের কাউকে একটা পয়সাও দেননি। সবাই শুধু বলে, তুমি কি বসে আছ?

আপনার মনে হয়, আরে কী মুশকিল, বেকার কখনো বসে থাকে? তারা দৌড়য়, ধরনা দেয়, দাঁড়িয়ে থাকে, হানা দেয়, হাত পাতে, প্রার্থনা করে, হাঁপায়, তাদের আর বসে থাকা হয় কখন? যারা ভালো অবস্থানে আছে, ইজি চেয়ার বা কুশন বা সোফায় বা গদিতে আরাম করে বসে থাকতে পারে কেবল তারা।

আর আপনার জীবন! নিজেকে মূল্যায়ন করেছেন ২৪ জুলাই ১৯৩১-এর দিনলিপিতে : একজন অসফল মানুষ, এক ব্যর্থতা, বেকার এক লাথি খাওয়া মানুষ বলে।

একদিন বুলুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বুলু ছিলেন, আর শোভনা। শিলংয়ের দিনগুলো নিয়ে কথা হলো। সেই কলেজ আর স্কুল নিয়ে আড্ডা, মজার কথা, দুঃখের কথা। তারপর বিষাদ ভর করল আপনার সমস্ত সত্তায়। মনে হলো, আহা, একটা পল্লীবালিকা যদি আসত আপনার জীবনে, যে আপনার জীবনটাকে সুরভিত করে তুলতে পারত ভালোবাসা দিয়ে! মাঝেমধ্যে মনে হয়, আপনি লিখেছেন আপনার দিনলিপিতে—'ওয়াই' হতে পারত সেই মেয়েটি। কিন্তু ওয়াই তো সে নয়। 'আহা, কোথায় পাব তারে! যদি পেতাম!' একদিন লিখেছেন, 'ওয়াই চিঠি লিখছে না, কিচ্ছু না, আমি তাকে কল্পনা করতে পারি রোমান্টিক দৃশ্যে, চুম্বন আর করুণায়, দু বছর আগেও সে ছিল জীবন আর মৃত্যুর সমান! কিন্তু এখন!'

আবার ওয়াইয়ের কথা আসে। আপনি যখন ওয়াইয়ের কাছে গিয়েছিলেন, স্নানের শেষে যেন এক দেবকন্যা বেরিয়ে এল, কেউ সাক্ষী ছিল না তার, শুধু একচোখো চাকর সহদেব ছাড়া! তাকে আপনি তিনটা পয়সা দিয়েছিলেন। এর পরে যতবার গেছেন এই ওয়াইয়ের কাছে, সহদেব পয়সার লোভে আপনার কাছে কাছে ঘুরত।

লাবণ্যর চিঠি আসে। যেন এক ছুরিকাঘাত। আপনার মনে হয়, সব ছেড়েছুড়ে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে পালিয়ে গেলে কী হয়? আর কোনো দিনও ফিরতে চান না আপনি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় সে বড় কাপুরুষতার কাজ হবে। আর শিশুকন্যা মঞ্জুর দায়িত্ব আছে না আপনার ঘাড়ে! আপনার মনে হয়, মঞ্জুই হলো এই পৃথিবীতে একমাত্র সৃষ্টি যাকে আগলে রাখতে হবে আপনাকেই।

আর আছে আপনার বাংলা। রূপসী বাংলা। কিছুদিন আগে ট্রেনে করে

চাকরির সন্ধানে আপনি গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। প্রচণ্ড গরম, আকাশে গনগন করছে সূর্য। ধুলো আর নোংরা। পুলিশের খিটিমিটি। তবু এরই মধ্যে আপনি কল্পনায় চলে যান আপনার সেই ধানসিড়িতীরে। এই বাংলার মাঠ ঘাট নদী আকাশ সূর্য ছায়া নীরবতা—এই সব ভাবতেই আপনার আরাম লাগে।

একদিন একটা চিঠি এল আপনার নামে। খামের ওপরে লেখা প্রফেসর জীবনানন্দ দাশ। নামের আগে প্রফেসর কথাটা দেখেই আপনার মনটা ভালো হয়ে উঠল। পুরোটা দিন মনে হলো রঙিন। কারণ এই বেকার জীবনে নিজেকে অধ্যাপক হিসেবে দেখতে আপনার ভালো লাগছে। বাস্তবে না হোক, চিঠির খামে তো আপনি এখন একজন অধ্যাপক। আহা, কী দুঃসহ বেকারত্বের দিনই না যাচ্ছে আপনার। যাচ্ছে আত্ম-অবমাননার দিন। পরেশ সেন নামে নামে সিটি কলেজের এক অধ্যাপকের কাছে গিয়েছিলেন ঠিক দুপুরবেলা, চাকরির আশায়। তিনি বললেন, আপনি তো মশায় ব্রাহ্মসমাজের নাম ডোবাবেন, আপনার পরিবার বরিশালের এই রকম একটা মানী পরিবার, সেই ফ্যামিলির ছেলে হয়ে আপনি এইসব প্রেমের কবিতা লেখেন, আপনার লজ্জা করে না। শুনুন, এইসব কবিতা-টবিতা ছাড়ুন। আপনার বই আমি পড়ে দেখেছি। খুবই আপত্তিকর কবিতা লেখেন আপনি। আপনার সমস্ত অস্তিত্ব তেতো হয়ে ওঠে, জীবনটা বিস্বাদ বলে বোধ হয়। সিটি কলেজের পেছনে অযথা এত দিন সময় নষ্ট করলেন। আপনার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এই সমাজ-সংসার, এই রক্ষণশীল সমাজপতিদের ওপরে।

আপনি একবার কলকাতা একবার বরিশাল করছেন। কলকাতার মেসজীবন, আর চাকরি খুঁজে ফেরা, আর চাকরি না পেয়ে নানা কিছু, একটা কিছু করবার চেষ্টা। তখন খুব টানে আপনাকে বরিশাল। বিশেষ করে ধানসিড়ি নদীতীর, অবারিত মাঠ আর ঘাস। ছেলেবেলায় আপনাদের আঙিনায় ঘাস কাটা হবে দেখে আপনি আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

কিন্তু বাড়িতেও শান্তি নেই।

সারাক্ষণ মা বকে চলেছেন, দিনের শেষে ডায়েরিতে তাই লিখে রেখেছেন আপনি, 'মাদার'স ক্যাট ক্যাট খ্যাট খ্যাট।' ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এর দিনলিপি লিখছেন আপনি। রাতের বেলা। সর্বানন্দ ভবনের গোলপাতার ঘরে বসে। নিজের একটা হারিকেনে নেই। কেরোসিনের প্রদীপের নড়ন্ত মৃদু

আলোয় পিঠ গুঁজে উপুড় হয়ে চলছে আপনার এই দিনলিপি রচনা। লিখছেন—'মায়ের এই ক্যাট ক্যাট খ্যাট খ্যাট যে আপনার পৌরুষ আর তার ব্যবহারের জন্যে অবমাননাকর, হানিকর, সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতেও পারবে না।' লিখছেন, বিয়ে করে স্ত্রী আর সন্তান গ্রহণ করেছেন, এ এক ভুল, এ জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছেন। কারণ এর ফলে রোমান্স, প্রেম এমনকি সহানুভূতি পাওয়ার অধিকারও আপনি হারিয়ে ফেলেছেন। হায় প্রেম! হায় রোমান্স! চিরটাকাল প্রেমের জন্যে এই কাতরতা গোপন দিনলিপিতে প্রকাশ করে যাবেন আপনি।

শরৎকাল। শরৎকালের এই বরিশাল, এই বাংলাদেশ, তার অপূর্ব আবহাওয়া, অসামান্য রূপ, সবই ভালো লাগে আপনার। গতকাল যখন হাঁটছিলেন পুরোনো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক, পথঘাট বদলে যাচ্ছে, পুরোনো পথ, পুরোনো ঘাট, পুরোনো প্রান্তের জন্যে মনটা আপনার যেন কেমন করে উঠেছিল। এই পথ দিয়ে কত হেঁটে গেছেন। এই বাজে পোড়া অশ্বথ গাছটাও আপনার কত প্রিয় আর পরিচিত। আকাশের নীল, ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ। কেমন একটা পুরোনো গন্ধ নাকে এসে লাগে। নদীর পাড় ধরে গেলে কী রকম নিচু মেঘ, ভরা নদী, আর চারদিকে ভেজা ভেজা ভাব। পান্নার মতো সবুজ ধানের ক্ষেত। এইসব দেখেন আপনি, হাঁটতে গেলে। অবশ্য ফুটবলের হল্লাটাকে আপনার মনে হয় অত্যাচার আর নদীতীরে সেদিন যে দেখেছিলেন কুকুর সমেত এক যুবককে—সেটা ভালো লাগেনি। সন্ধ্যায় শোনা যায় পুজার কাঁসরধ্বনি, ভবসিন্ধুর গান, আমার প্রাণটার ভেতর কেমন করে, শুনে আপনার প্রাণটাও যেন সত্যি কেমন করে ওঠে। এই গায়ক এখন খ্রিষ্টান, তার ল্যাড্রুচ সাহেবের কারণে।

নিজের বিগত দুটো বছরের দিকে তাকালে আপনার মনে হচ্ছে একেবারেই নিষ্ফলা গেল এই দুটো বছর। প্রায় কিছুই লেখা হলো না। শুধু বিয়ে আর সন্তান উৎপাদন। আর একটা প্রেমহীন করুণাহীন দাম্পত্য। সারাক্ষণই প্রায় লাবণ্য অভিমানাহত হয়ে থাকেন। কখনো সখনো তার রাগ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

লাবণ্য বারবার করে বলছেন সিটি কলেজের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কিছুর জন্যে চেষ্টা করতে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে। নিজেকে বাড়িয়ে নিতে। সব কিছু মিলে এক গভীর বেদনায় আপনার অন্তরটা আচ্ছন্ন হয়ে

থাকে। কোথাও কোনো প্রেম নেই, আশা নেই, করুণারও লেশমাত্র যেন নেই। কবিতা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসছে পত্রিকা থেকে। শরীরটাও আজকাল ভালো যাচ্ছে না। মাথাব্যথা, সারা শরীরে ব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো লাগে। মনে হয় এই সময় কেউ যদি একটু হাত-পা টিপে দিত। তাতে শরীরের ব্যথা না কমুক, মনটা তো খানিকটা শুশ্রূষা পেত। সেইটা আশা করা যে বাতুলতা তা আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। রাতে আপনার ভালো করে ঘুম হয় না।

বরিশালে এসেছেন দিন দশেক হলো। এসে মনে হলো, না আসাই ভালো ছিল। কেউ আপনাকে যেন আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাল না। থাকবার একটা ভালো জায়গা পর্যন্ত জুটল না। বিছানাপাতির ঠিক নেই। সবখানেই বিশৃঙ্খল অবস্থা। মাঝেমধ্যে খুব বৃষ্টি হলে আপনি শরৎচন্দ্রের বই নিয়ে বসছেন। *দত্তা* পড়ে শেষ করলেন। আপনার তেমন ভালো লাগল না। মনে হলো আরও অনেক পোক্ত করা যেতে পারত উপন্যাসটাকে। আপসে সব কিছু মিটিয়ে মিলিয়ে দেন শরৎ। তার ট্র্যাজেডিও অন্য রকম। দুই প্রজন্মের ঝগড়া, সেটা কি না মেয়েদের জিনিসপাতি নিয়ে। কী যে গোঁড়ামি আর অন্ধ বিশ্বাস...

আপনার মেয়ে মঞ্জু আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনার মনে হচ্ছে, এ যেন হাতিপোষা। শাশুড়ি বউয়ে এসে দেখে যাচ্ছে মেয়েটাকে, যেন শেষকৃত্যের আগে দেখে নিচ্ছে মড়া। আপনার মনে হচ্ছে এই বিয়ে আপনি কেন করলেন। আহা, আবার যদি অবিবাহিত জীবনটা ফিরে পেতে পারতেন!

এর মধ্যে শোভনার পোস্টকার্ড এসেছে। বুলু এই বাড়িতেই আছে। সে তেমন আগ্রহ দেখাল না। সে একদিক থেকে ভালোই। তবে বুলু মাঝেমধ্যে শিলংয়ের গল্প পাড়ে। আপনার তখন খুব শোভনার কথা মনে পড়ে।

একটা সময় অনেক চিঠি লিখতেন শোভনা। অনেক কথা থাকত সে সবে, কিন্তু পাথর চিপে যেমন জল বের করা যায় না, তেমনি সেই চিঠিগুলোর ভেতর থেকে কোনো দরদ আবিষ্কার করতে পারা যায় না। পাতার পর পাতায় বালিকা শোভনা লিখতেন স্কুলের কথা, কলেজের কথা, দিদির কথা, তার ছেলেমেয়েদের কথা, গরম চা খেতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে

ফেলবার বিবরণ, কিন্তু তার হৃদয়ে যে আপনার জন্য একটুখানি অন্য রকম আবেগ বা অনুভূতি আছে, তিনি তার ইঙ্গিতও দেননি। এই সব চিঠির ভেতরে আছে একজন সামান্য নারীর অবৈধ আত্মপ্রতিষ্ঠা আর অসংখ্য বানান ভুল। তবু এই মেয়েটির জন্যেই পৃথিবীর সমস্ত আকাশটাকে নীল বলে মনে হয়, পাতাগুলোকে সবুজ, ফুলগুলোকে রঙিন। প্রেমের কাব্য, উপন্যাস, কিংবদন্তি–যা কিছু পড়েছেন আপনি, সবই দেখেছেন এই মেয়েটিকে পটভূমিতে রেখে। হয়তো আপনার হৃদয়ের এই বিশেষ বিক্রিয়াটার এই খবর তিনি জানেনও না, জানলেও সেটাকে পাত্তা দেয়ার মতো গভীরতা তার নেই।

পরের দিন এল আরেকটা দুঃসংবাদ। *এডভান্স* পত্রিকায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নিয়ে যে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, তা থেকে আপনার নাম বাদ দেয়া হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে যে বিষাক্ত প্রচারণা চলছে এ হলো তারই ফল। খুবই মুষড়ে পড়লেন আপনি। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি, নিজেকে বললেন, মাথা ঠাণ্ডা। একদম ঠাণ্ডা। কিন্তু কারও না কারও সঙ্গে তো আপনার এই মনোবেদনা ভাগাভাগি করে নিতে হবে। আপনি শেষতক মার শরণাপন্ন হলেন। বললেন, মা, মনটা ভালো না।

'কেন?'

'এই যে চাকরিবাকরি হচ্ছে না। মঞ্জুর অসুখ। নিজেরও শরীরটা ভালো না। তার ওপর একটা খারাপ খবর পেলাম?'

'খারাপ খবর? কী হয়েছে বাবা?'

'আধুনিক বাংলা কবিতা প্রবন্ধ থেকে আমার নাম বাদ দেয়া হয়েছে।'

'এই জন্যে মন খারাপ। না, মন খারাপ করো না। তুমি যদি ভালো কবিতা লেখো, আজ কোন প্রবন্ধে তোমার নাম ছাপা হলো না হলো তাকে কিছু যায় আসে না। রবীন্দ্রনাথেরও খুব সমালোচনা হতো প্রথম দিকে। এখন তো সবাই গুরুদেবকে মাথায় তুলে রাখছে। তুমি লিখে যাও। একদিন এরাই তোমার নাম বলে নিজেদের ধন্য করবে।'

আপনার মা মিথ্যে বলেননি। আপনার কিছু সান্ত্বনা লাভও হলো তাতে। কিন্তু তবু যেন মনে হয়, মা তো নিজের সন্তানের ভালোটাই দেখবেন। তার মত তো নিরপেক্ষ হতে পারে না।

প্রিয় জীবনানন্দ,

লাবণ্যর সঙ্গে আপনার কথাগুলো আমরা পাচ্ছি লাবণ্যর স্মৃতিকথায়। আর শোভনার সঙ্গে কথাগুলো? ইঙ্গিতটা আপনার দিনলিপিতে, আর বিবরণটা, আপনার লেখা গোপন গল্পগুলোয়। আর এই যে আপনার বরিশাল কিংবা কলকাতার মেসজীবনের বেকারত্বের দিনগুলো? আপনার দিনলিপিতে।

আপনি কি হাসছেন? সেই নিষ্কলুষ হাসিটা? নাকি বিষাদময় হাসিতে মুখটা ধূসর মেঘের আস্তরে ঢেকে যাচ্ছে? শোভনাকে আপনি প্রথম কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। অন্য বোনদের চেয়ে আপনি শোভনাকেই হয়তো একটু বেশি ভালোবাসতেন সেও তো ঠিকই। কিন্তু...

কিন্তু বিয়ের পর আপনার যে ডায়েরি আপনি লিখেছেন, বিয়ের এক বছর পর, দু বছর পর, তিন বছর পর, সেসবে ঘুরেফিরে আসছে ওয়াইয়ের কথা। কে এই ওয়াই? ইংরেজি পঁচিশতম বর্ণে চিহ্নিত মেয়েটি কে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর শোভনা চলে আসেন কলকাতায়। হোস্টেলে থাকতেন। রাজসিক হোস্টেল, কড়া তার নিয়মকানুন। ১৯৩০-৩৫ সালে আপনি বেকার, এবং বিবাহিত, স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা থাকেন বরিশালে, আর আপনি মাঝেমধ্যে আসতেন হোস্টেলের গেটে, স্লিপ পাঠিয়ে ডেকে আনতেন শোভনাকে, কখনো দেখা হতো, কখনো হতো না।

১৯৩২ সাল। ৩ আগস্ট। আজ শোভনার জন্মদিন। আপনি আপনার ডায়েরিতে লিখেছেন, থটস অব ওয়াই'স জন্মদিন : নো ইনভাইটেশন। সারাটা দিন মনটা উত্তল আর বিষণ্ণ ছিল আপনার। শোভনার জন্মদিন গেল, কিন্তু তিনি আপনাকে ডাকলেন না একটিবারও। যেহেতু আপনার ডায়েরিতে ওয়াইয়ের জন্মদিন আর বাস্তবজীবনের শোভনার জন্মদিন একই, সেহেতু আমাদের বারবার মনে হবে, শোভনাই ওয়াই।

তখন আপনি থাকেন মেসে-বোর্ডিংয়ে। চাকরিবাকরি নেই। নানা কিছু করার চেষ্টা করছেন। টিউশনি, জীবন বীমার দালালি, নোটবই লেখা। ১৯২৯ কি ১৯৩০-এ আপনার ডায়েরিতে আছে, 'বারবার ঘড়ি দেখছি রাতে—সিডি সিকিং গ্রে হেয়ারস (চুল পেকে যাচ্ছে)—রাতের জাহাজ—ভালোবাসা ও বালিকারা (কাজিনেরা)—পৃথিবী যেকোনো সময় খতম হয়ে যেতে পারে।' আহা! একটি মেয়ের জন্যে এই যে সারা রাত নির্ঘুম কাটানো, আর তাকে না পেয়ে তার চিঠি না পেয়ে জগৎটাকেই বিধ্বস্ত

বলে মনে হওয়া, এর নামই তো প্রেম! জীবনানন্দবাবু!

ওয়াই যে শোভনা ওরফে বেবি হতে পারেন, গবেষকদের মাথায় এটা আসে একটা সূত্র ধরে, কোথাও কোথাও নাকি আপনি বি-ওয়াই লিখেছেন। বি-ওয়াইতে বেবি হতে পারে, সেটা ধরে নিয়েই তাদের যাত্রা শুরু। সেখান থেকেই জানা গেল বেবি তথা শোভনার ওপরের গল্পগুলো।

আবার আপনারই একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির ভেতরের মলাটে লেখা আছে ওয়াই = শচী। এক জায়গায়, বিচ্ছিন্নভাবে। এখন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, শচী কে?

আপনার খুড়তুতো বোন বুলুর একজন বান্ধবীর নাম ছিল শচী, এই তথ্য আপনার গবেষক ও আপনার একান্ত অনুরাগী ভূমেন্দ্র গুহ অনেকবার লিখেছেন। পরে তিনিই এই লেখককে টেলিফোনে বলেছেন, শচী বলে কেউ ছিল না, শোভনাই ওয়াই।

তবু শোভনাই যে আপনার একমাত্র রোমান্টিকতা, তা নাও হতে পারে। কৈশোরে দেখা একখানা মুখ, যাকে আপনি *কারুবাসনা*-য় নাম দিয়েছেন বনলতা, সে হয়তো হতে পারে আলাদা কেউ। কিংবা শচী আলাদা, শোভনা আলাদা, বনলতা আলাদা।

অথবা, যেকোনো বিশুদ্ধ রোমান্টিকের মতো, একজন আদর্শ মানসপ্রিয়াকে আপনি সারাক্ষণ খুঁজে গেছেন, তার মূর্তি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন, একজনের পর একজনের মুখে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন সেই প্রত্যাশিত প্রেয়সীকে, তাকে পাননি। হয়তো বেবিকে, শোভনাকেই আপনি ভেবেছেন সে-ই, কিন্তু হায়! শোভনা তো সে নয়। এ পৃথিবী এক দিনই তাকে পায়, কোনো দিন পায় না আবার।

অন্যভাবে বলা যায়, ওয়াই = শচী লিখেছেন বটে, এখানে আপনি ওয়াইকে ডিকোড বা উন্মোচন করেননি, কারণ ওয়াইকে আপনি জানেন, *গ্রাম ও শহরের গল্প*-এর শচীকে চিহ্নিত করেছেন ওয়াই বলে, অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন, *গ্রাম ও শহরের গল্প*-এ যে শচীর কথা আমি লিখছি, আসলে সে শচী নয়, সে ওয়াই, অর্থাৎ কি না সে শোভনা!

আমাদের বনলতার ঠিকুজি-কুলুজি আবারও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কিন্তু আমরা আমাদের অন্বেষণ থামাচ্ছি না।



হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়াছে দিশা

"...our marriage is a scrap... সারারাত কাঁদে...উঠে পড়ি...কি করব? আত্মহত্যা? হার্টফেল? শীতের রাতে অন্ধকার পুকুরে ডুবে মরব? ...আগে এ রকম করার পর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইত..." লিখেছেন আপনি, আপনার দিনলিপিতে, বিয়ের সাড়ে তিন বছরের মাথায়, ১৯৩৩-এর ডিসেম্বরে। এই রকমই ছিল লাবণ্যর সঙ্গে আপনার দাম্পত্য। কলকাতা থেকে বরিশালে তিন মাস আগে এসেও দেখতে পেলেন, সেই পুরোনো প্রত্যাখ্যান। কথা বন্ধ। সারাক্ষণ একটাই তার অভিযোগ, তুমি আমার কী বেনিফিট করেছ চার বছরের মধ্যে? আপনার সম্পর্কে তার এই অভিযোগ আর উদ্বেগ আপনাকে তার সম্পর্কে একেবারেই নেতিবাচক করে তুলেছে, আপনার মূল্যায়ন। এমনও হয়েছে, তিন-চারদিন লাবণ্য দরজা বন্ধ করে থেকেছেন, ঘর থেকে বের হননি, কিছুই খাননি, হয়তো মুড়ি আর জল ছাড়া। আপনার মন্তব্য—'এ বাড়ির সবাই তার পর। ভূতে পায় নাকি?'

একবার কলকাতা, একবার বরিশাল। আপনার আর্থিক অবস্থা তলানিতে ঠেকেছে। কাজ নেই, উপার্জন নেই। কী করবেন আপনি? ভেবেছেন নানা কিছু। লিখেছেন দিনলিপিতে সম্ভাব্য জীবিকাগুলো—"কী করব আমি? চায়ের দোকান? মিষ্টির দোকান? রুটি বিস্কুটের দোকান? হাঁসমুরগি পালন? মাছের চাষ? আফিম বিক্রি? মদের দোকান? জুতা তৈরি? ছাদের পলেস্তারা সকালে খসে পড়েছিল আজ আমার ওপরে।' শুধু কি ছাদের পলেস্তারা, আপনার ওপরে যেন ভেঙে পড়ছে সমস্তটা আকাশ। কবিতা আসছে না। লেখা হচ্ছে না। সারাক্ষণ রোজগারের চিন্তা। সহ্য করতে পারেন না। ছেঁড়া শার্ট আর ছেঁড়া ধুতি সম্বল। কন্যা মঞ্জুর জন্যে একগজ রদ্দি ছিট কাপড়ও কেনার সামর্থ্য নেই, এই বেকারত্ব কী ভয়াবহ।

একবার ভাবছেন জীবন বীমার দালালি করবেন। এক বন্ধু বছরে এক লাখ টাকা বীমা করিয়ে ছ হাজার টাকা কমিশন পাচ্ছে, মানে মাসে ৫০০। কিন্তু আপনি কি তা পারবেন। আপনার মনে হয়, সম্ভবত আপনার অনাকর্ষণীয় চেহারা আর বোকা বোকা ভাব আপনাকে একটা অস্তিত্বহীন সত্তায় পরিণত করে রেখেছে। ভাবছেন, যদি সুট-কোট-টাই পরে হাতে একটা এটাচে নিয়ে ধোপদুরস্ত একটা এজেন্টের মতো কাজে বেরিয়ে পড়তে পারতেন! কিন্তু টাকা পাবেন কোথায়? ভালো পত্রিকায় তো আপনার লেখা ছাপা হয় না!

আপনার দিনলিপিতে যখন এইসব বিবরণ পড়ি, মনটা কেমন কুঁকড়ে যায় প্রিয় কবি। ইস, কতটা ধকল গেছে আপনার কবি-হৃদয়ের ওপর দিয়ে। হায়, পৃথিবীতে কত লোকই তো কত অনায়াসে জীবনটা স্বচ্ছন্দে যাপন করে গেল, আপনার একটা রুটিরুজির ভালো ব্যবস্থা কি হতে পারত না? পরক্ষণেই আবার স্বার্থপরের মতো লাগে নিজেকে, মনে হয়, তা না হয়ে ভালোই হয়েছে, বীমা কোম্পানির সার্থক দালাল কিংবা মালিক আমরা অনেক পাব, কবি জীবনানন্দ কি আর এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা আসবে? অনেক আগুনে পুড়েছিলেন বলেই তো আমরা এই রকম এক কবিকে লাভ করেছি।

হ্যাঁ, যেদিনই ভাবছেন বীমার দালাল হওয়ার জন্যে সুট-টাইয়ের কথা, পরের মুহূর্তেই ফিরে পাচ্ছেন আপনার কবিদৃষ্টি। 'উল্টোদিকের ছাদে একটা চিল... একটা বুড়োটে চিল? সোনালি মোটেই নয়—পাটকিলেও নয়, বর্ণের কোনো বাহাদুরি নেই—বিবর্ণ বাদামি, চিমনির ধোঁয়াকালির মত পেছনের দিকের পালকগুলো, সামনের পালকগুলো প্রায় গতিহীন বর্ণশূন্য—সামনের দিকে মাঝে মাঝে শাদা দাগ...ধানধুয়ের মত...ধূসর বা প্রাকৃতিক শাদা পালক—চিলটা উদাসীন—অকুতোভয়...বড় ক্লান্ত—মনে হচ্ছে বড় ভুগছে—আধো হাঁ করে কুকুরের মতো নিঃশ্বাস ছাড়ছে—ঘাড় মুখ সব দিকে—এমনকি একেবারে বিপরীত দিকে ঘোরাতে পারে—ভারি আশ্চর্য আর অদ্ভুত এই ক্ষমতা...

মনে পড়ে একদিন সিনেমা হলে গিয়ে দেখে এসেছিলেন *চণ্ডীদাস* ছবিটা! ওয়াই এই ছবিটা আগেই দেখেছিল। আপনার ছবিঘরে গিয়ে বারবার মনে পড়ছিল ওয়াইয়ের কথাই। ওয়াই কি সবগুলো পয়েন্ট বুঝেছিল? আপনার মনে ভাবনা! সে কি আপনার কথা ভেবেছিল একটুও? অথবা ভেবেছিল কবি আর কবিতার কথা? সে রাতে আপনি দিনলিপিতে

লিখেছিলেন, ওই একান্ত অনুরাগ থেকে আপনি এখন মুক্ত...কী ভীষণভাবেই না আপনি এই ভাবনায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন যে, ওয়াই হলো একমাত্র নারী আর তার ভালোবাসাই আপনার হৃদয়ের জন্যে একমাত্র ভালোবাসা...

আসলে কি আপনি ওয়াইয়ের গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন কোনো দিনও, জীবনানন্দ দাশ?

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;

আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

কার মুখ? একবার ভাবেন, মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন, আমার জীবনে আমি কোনো দিনও পাইনি একটা প্রকৃত কিশোরী, যে হয়তো পার্থিবভাবে গরিব, কিন্তু আত্মিকভাবে অনেক বড়, আমি সততার সঙ্গে বলতে পারি না কোনো একটি বালিকা আমার জীবনের অতীত অভিজ্ঞতা বিকীরিত করতে পেরেছে...

তারপর একটা চাকরি জুটে গেল আপনার। বরিশালের বিএম কলেজেই। ১৯৩৪-এর আগস্টে। নিয়োগপত্র পেলেন। নিজেকে মনে হলো, কত কয়েক বছরের কর্মহীনতার ধকল আপনাকে একটা ভগ্নস্তূপে পরিণত করে রেখে গেছে। 'একজনকে বিচার করা উচিত তার শক্ত ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক জোর দিয়ে, কিন্তু সেসবের কিছুই তো আর আমার অবশিষ্ট নেই'—ওই দিনে আপনার মূল্যায়ন।

চাকরি চলছে। ফিরে পেলেন সেই ধানসিড়িটির তীর। সেই নদীপার, ঝাউগাছ, বিজয়া দশমীর রাত, একটা নিঃসঙ্গ দোয়েল কিংবা একটা চকচকে পলিশকরা দাঁড়কাক রায় বাহাদুর বা সাব জজের মতো করে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়। আবার আপনি মিতালি পাতছেন মাতা প্রকৃতির সঙ্গে, আমড়া কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতায় ভরে ওঠা, লেবুপাতার ফাঁকে লেবুর উদ্ভব, সূর্যমুখী ফুলের ফুটে ওঠা আর সূর্যের দিকে মুখ ঘোরানো সারাবেলা, বৈশাখ মাসে

বৈরাগীদের গান...বৈষ্ণবীদের গলার মধ্যে কী এক মোহ আছে বলে মনে হয় আপনার, আপনার হৃদয় দুলে ওঠে কৃষ্ণের প্রেমলীলার আকর্ষণ, মহত্ত্ব, উপশমের ক্ষমতা দেখে।

তারপর শুরু হয় কলেজের চাকরিতে অশান্তি। আপনাকে বড় ক্লাসে পাঠ দিতে দেয়া হয় না। একদিন দেখেন বেতনের খাতা থেকে লাল কালিতে আপনার নাম কেটে দেয়া হয়েছে। আবার কর্মহীনতা! সেই দুঃখ, সেই ধিক্কার, সেই বিষাদ...

অশান্ত মনে ঝড় বইছে। ভাত খেতে বসেছেন। একটা বিড়াল ঘুরঘুর করছে। ভাতের থালা দিলেন ছুড়ে ফেলে। বিড়ালছানাটা চলে গেল। আর ফিরে এল না। মঞ্জু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। খুবই মন খারাপ হলো, নিজের ওপরে নিজেরই। মেয়েটার সামনে এমন করা ঠিক হয়নি। ঠিকই আসবে, কান মলে দেবে, বলবে, বাবা তখন কেন এমন করেছিলে। এই জগতে যদি সত্যিকারের ভালোবাসা থাকে, তাহলে তা বাবার সঙ্গে মেয়ের, যত দিন না মেয়ে বড় হচ্ছে, তার নিজের জগৎ তৈরি হচ্ছে...

একটা বিস্কুটের টুকরায় অনেক পিঁপড়ে জড়ো হয়েছে। সবগুলোকে পিষে মারলে একটা ভূমিকম্পের মতো প্রলয় ঘটে যাবে না ওদের ওপর দিয়ে! থাক। আপনি ভাবেন। এক জায়গার রাগ আরেক জায়গায় দেখিয়ে কী হবে।

শেষে বিএম কলেজেই চাকরিটা স্থায়ী হলো।

এইবার একটু সাংসারিক প্রয়োজনের দিকে নজর পড়ল। ঘরটা বাড়াতে হয়। মেঝেটা সিমেন্ট দিয়ে পাকা করা দরকার। একটা চায়ের কাপের সেট না কিনলেই নয়। আর উঠোন জুড়ে তো আছেই কামিনীগাছ, শেফালি, গন্ধরাজ, কাঁঠালিচাঁপা...

এর মধ্যে বুদ্ধদেবের চিঠি আসে। বুদ্ধদেব বসু আপনার অনেক প্রশংসা করেন। 'কবির কবি আপনি, নিজের ট্রাডিশন জেনে তৈরি করছেন।' নিজের সম্পর্কে মূল্যায়ন করেন, 'কবিতা আমি পেন্সিল দিয়ে লিখি... অলস... চোখ খারাপ এবং সব উপায়েই প্রমাণিত করে চলেছি আমি খুবই অলস, স্বতঃস্ফূর্ত এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিভা...'

ধূসর পাণ্ডুলিপি বেরয়। আপনি মনে মনে কিন্তু তীব্রস্বরে চিৎকার করে ওঠেন, "আমাকে অবসর দাও, দাও টাকা আর প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক বইপত্র, আমি হব আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শীর্ষতম ব্যক্তিত্ব।"

লেখালেখির প্রয়োজনেই মাঝেমধ্যে কলকাতা আসেন। কিন্তু সবার সঙ্গে ঠিকমতো মিশতে পারেন না। আপনার মনে হয়, 'পুরুষের পৌরুষ বা সৌন্দর্য...কিছুই আমার নেই, থ্যাবড়া নাক, ছোট ঘাড়, পৃথুল কদাকার শরীর, কুৎসিতভাবে কুৎসিত, গাইতে জানি না, জানি না খেলতে, কথা বলতে...বাজে কণ্ঠস্বর, সাংগঠনিক ক্ষমতা দুর্বল, কৌশলী নই, নই আগ্রাসী কিংবা ক্রূর, চাটুকারিতা করতে জানি না...।' খুব আফসোস হয়, ভাবেন, 'এতদিনে *এবিপি*, *এডভান্স*, *বিচিত্রা* ইত্যাদিতে কিছু বেরল না, *প্রবাসীর* জন্য নিয়েছে কিন্তু বার করেনি, সবার মুখেই শুধু বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, তারপর অর্ধস্ফুটভাবে জীবনানন্দ দাশ...আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথও কি আমার মতো ভাবতেন যখন দেখতেন কোনো নতুন ধারা ধেয়ে আসছে তার দিকেই, তাকে ঘিরে ফেলতে? একটা জিনিস নতুন বলেই কি তা ভালো?'

বরিশালে ফিরে এসে আবার স্বপ্ন বুনে চলেন। কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এইসব নিয়ে নতুন নতুন কথা হচ্ছে কলকাতায়। সেসব থেকে দূরে এক নিবিড় স্বপ্নকল্পনার জগতে নিবিষ্ট হন। আপনার কল্পনায় রোমান্টিকতা থাকে, থাকে যৌনতাও...সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতা থেকে যখন জাগেন, আপনার মনে হয়, এই বুড়োটে অধ্যাপক আবার রোমান্টিক স্বপ্ন আর কামনা পোষণ করছে কেন!

আবারও হেমন্ত এসেছে। হেমন্তকে আপনার মনে হয় ভীষণ সংবেদনশীল এক ঋতু। আপনি সিদ্ধান্ত নেন, রোমান্টিক আর রহস্যময় বিষয়ই আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ পছন্দ। যদিও জানেন, আপনার বিরুদ্ধে সেইটাই সবচেয়ে বড় সমালোচনা, আপনাকে বলা হয় নকল রোমান্টিক, অপ্রগতিশীল, অবাস্তব, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

তাতে আপনি ব্যথিত হন, কিন্তু আপনার কর্তব্য থেকে চ্যুত হন না। এরই মধ্যে আপনি লিখে ফেলেছেন সেই অনবদ্য কবিতাগুলো, *বনলতা সেন* আর *রূপসী বাংলার*। জ্যোৎস্নারাতে ন্যাড়া কৃষ্ণচূড়া গাছে একটা পাখি একটানা ডেকে চলেছে, কী যে ভালো লাগছে আপনার, আপনার মনে হয় জগৎটা যদি অর্থনীতিবিদ, গণনবিদ আর কমিউনিস্টদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে পাখিদের হাতে ছেড়ে দেয়া হতো...পক্ষিবিশারদরা হয়তো পাখিটার নাম জানবেন, কিন্তু আমি তাদের চেয়েও এই পাখিটার বেশি ঘনিষ্ঠ, কী অপূর্ব তার আত্মা-নাড়ানো ডাক...



পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

প্রিয় জীবনানন্দ দাশ,

১৯৩৩/৩৪ সালের দিকে আপনি *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলো লিখেছিলেন। ওই কবিতাগুলো আপনার আরও অনেক গুপ্তধনের মতোই আবিষ্কারের অপেক্ষায় ছিল ট্রাংকের অন্ধকারে, আপনার মৃত্যুর পরে সেসব প্রকাশিত হয়। *বনলতা সেন* বইয়ের কবিতাগুলোও ওই সময়েই লেখা। ১৯৩৫ সালে পত্রিকায় প্রথম বেরোয় *বনলতা সেন* কবিতাটি। একই সময়ে একই কাব্যগ্রন্থভুক্ত 'কুড়ি বছর পরে' কবিতাটিও বেরিয়েছিল। 'কুড়ি বছর পরে' কবিতায় আপনি লিখেছেন, মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।

> অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর;
> ব্যস্ততা নাইকো আর,
> হাঁসের নীড়ের থেকে খড়,
> পাখির নীড়ের থেকে খড়
> ছড়াতেছে; *মনিয়ার* ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।
> (কুড়ি বছর পরে, *বনলতা সেন*)

আকাশে সাতটি তারা কবিতায় আবার আসে মনিয়ার নাম, তবে খুব দুঃখজনক একটা ঘটনার সূত্র ধরে, উপমা হয়ে। মনিয়া মারা গিয়েছিল, এই নীলনয়না তরুণীটি, গঙ্গাসাগরের জলে ভেসে উঠেছিল তার লাশ, সে কি আত্মহত্যা করেছিল?

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত *মনিয়ার* মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—
(আকাশে সাতটি তারা/ *রূপসী বাংলা*)

আপনার লিটেরারি নোটসেও আছে মনিয়ার কথা। তাকে নিয়ে একটা বড় উপন্যাস বা গল্প লেখার পরিকল্পনা প্রায় বিশদভাবেই আপনি করে রেখেছেন সেই নোটে। মনিয়াও দেখা যাচ্ছে, আপনার মগ্ন চৈতন্যে হানা দিচ্ছে বারবার। কে এই মনিয়া?

মনিয়ার চোখজোড়া ছিল নীল। আপনার মনেও প্রশ্ন জেগেছে, ১৬ আগস্ট ১৯৩১-এর দিনলিপিতে আপনি লিখেছেন, 'মনিয়া : নীল দুচোখ (পর্তুগীজ ঔরস?) ... সৈয়দপুরের পাদ্রী হয়তো কিছু করে থাকবে...'।

মনিয়া আপনাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করত। সৈয়দপুরে তার জন্ম। জন্মের পর পর্তুগিজ পাদ্রী বাবা নিরুদ্দেশ। তার মা নানা জায়গা ঘুরে শেষতক ঠাঁই নেন বরিশালে। সর্বানন্দ ভবনের কাছেই কোনো একটা জায়গায় ঘর হলো তার। সেই ঘরে শীত আর শিশিরের জল ঝরে পড়ত। পাশেই অক্সফোর্ড মিশন। খ্রিষ্টান মিশনারিদের নানা কাজে লাগতেন মনিয়ার মা। আসতেন ব্রাহ্মবাড়িগুলোতেও, ফাইফরমাশ খাটতেন। একটু বড় হলে মনিয়াও আসত তার পায়ে পায়ে। মনিয়া কিন্তু লেখাপড়া করত। কুসুমকুমারী দাশ, কুমারী স্নেহলতা চক্রবর্তী, কুমারী লীলাময়ী চক্রবর্তীদের তত্ত্বাবধানে সে পড়ত সর্বানন্দ ভবনের রবিবাসরীয় নীতিশিক্ষা স্কুলে। এই শিক্ষয়িত্রীরা তো বটেই, সর্বানন্দ ভবনের ছেলেরাও তাকে পড়াতে কম উৎসাহী ছিল না। খুবই ডানপিটে গেছো টাইপের মেয়ে ছিল মনিয়া। মনিয়া পাখি ধরে আনত, কোলে হয়তো একটা মোরগ নিয়ে ঘুরছে, জিজ্ঞেস করলে বলত কাকাদের ওখান থেকে কিনে আনলাম। কাঁঠাল গাছ থেকে এক বাড়ি মেরে পোকা খাওয়া পাখি মেরে ফেলেছিল একবার। আপনার কলকাতা ফেরত কাকাতো-পিসতুতো ভাইয়েরা মনিয়াকে দেখত ঝিয়ের মতোই, তবু তার আকর্ষণও তারা অস্বীকার করতে পারত না, তারা তাকে মুগ্ধ করতে পটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করত, অবণী তাকে অপব্যবহার করত। তারা তাকে এটা ওটা দেয়, বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করে তাকে মোহিত

করতে চায়, আর সে নিজে পছন্দ করে এদেরই ছোট ভাইটিকে, আপনার পরিকল্পিত গল্পে আপনি যার নাম দেন হারু। হারুর সঙ্গে নানা কোণাকাঞ্চিতে, ঘুপচিতে সে দেখা করে।

মনিয়া এর বাগানের ফলটা মুলোটা চুরি করে, ধরা পড়ে আর পিটুনি খায়। পুকুরদিঘির পাড়ে ঘুরে বেড়ায়, কোলে কুকুর বেড়ালের বাচ্চা, জোনাকি ঝিঁঝি ধরে দেখতে চায় তারা কেমন। তার সমবয়সী সবার বিয়ে হয়ে যায়; কিন্তু তার বিয়ে হবে কী করে? এর ওর বেণি করে দেয়া, চুল বাঁধা, হাত-পা টেপার কাজ করে দেয় সে, দোকানসদাই করতে পাঠায় তারা তাকে। বড়লোকের বাড়িতে গ্রামোফোনের গান শুনতে গিয়ে পায় অযাচিত চুমুর স্বাদ। শখের থিয়েটারে অভিনয় করতে গিয়ে পারে না, আর অপমানিত হয়। মনিয়ার হৃদয়টা ছিল ভালোবাসা আর করুণায় ভরপুর, কুষ্ঠরোগীকে সে তাদের খোরাকির চাল দান করে দিলে তার মা তাকে ভীষণ বকেন। অন্তত আপনার গল্পের মনিয়া এই রকমই দানবতী।

আপনি মনিয়াকে যে স্নেহ করতেন, তার প্রতি যে আপনার সচেতন সানুরাগ অভিনিবেশ ছিল, আপনার এই লেখায় তা স্বতঃপ্রকাশিত। আপনার দিনলিপিতে তার উল্লেখ থাকে। আপনার কবিতায় সে জায়গা করে নেয়।

কিন্তু কিশোরীটি কেন ভেসে উঠল গঙ্গাসাগরের জলে? কী এমন গভীর কষ্ট তাকে পৃথিবীছাড়া করল? সে তো সাঁতার জানত। তবু কেন জলে ভেসে উঠল তার দেহ, তার চুলরাশি?

আর এই বাংলাকে দিনলিপির একটা জায়গায় আপনি বলেছেন, মনির বাংলা। গত শতকের প্রথম দিককার বাংলা, যে বাংলায় মনিয়ার মতো মেয়েরা বাস করতে পারত।

প্রিয় কবি, আমরা এই লেখাটা শুরু করেছিলাম বনলতা সেনকে খুঁজতে, তাকে পাচ্ছি কিংবা পাচ্ছি না, আমাদের অন্বেষণ অব্যাহত থাকছে, কিন্তু সেখান থেকে আরও আরও অপরূপ চরিত্র পেয়ে যাচ্ছি, যারা আপনার কাব্যভাবনাকে আকার দিয়েছিল, যারা আপনাকে দিয়ে লিখে নিয়েছিল অসম্ভব সব পঙ্‌ক্তিমালা। আমাদের এই এষণা তাই বৃথা যাচ্ছে না।



সবুজ ঘাসের দেশ

আরেকবার আপনার লেখায় আমরা পাব বনলতার কথা।

কলকাতা ছাড়ছি (১৯৩২ সালের আগস্টে লেখা) নামের উপন্যাসে।

কলকাতা ছাড়ছেন আপনি। খুবই আরাম বোধ করছেন এই ভেবে, আজকে আর চাকরি খুঁজতে হবে না। কোথাও গিয়ে অকারণ ব্যর্থতাভরা ঘোরাঘুরি করতে হবে না।

বিছানায় বসে ভাবছিলেন, এই কলকাতায় কবে ফিরে আসেন কে জানে, ডায়োসেশন কলেজের সেই মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা করে আসা দরকার।

বলছেন, মেয়েটা অপরিচিত নয়, ছ বছর ধরে তার সঙ্গে চেনাশোনা কথাবার্তা চিঠিপত্র চালাচালি আলাপ, দু বছর ধরে দুজনের মুখ বন্ধ।

যেন আপনারা দুজন আছেন এই পৃথিবীর দূরতম দুই স্থানে, একজন পিকাডেলিতে তো আরেকজন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

আপনিও খুব সংযমের পরিচয় দিয়েছেন যা হোক, ভেবে বেশ একটা আত্মমর্যাদাবোধ জাগছে, দু বছরে একটা পোস্টকার্ড পর্যন্ত লেখেননি তাকে।

ভাবছেন, নিজেকে বোঝাচ্ছেন, এই সংযমের মধ্যে কেবল মর্যাদাই নেই, আছে ঢের পরিতৃপ্তিও। কাজটা কঠিনও অবশ্য।

কিন্তু, লিখছেন আপনি, 'কিন্তু আজ তবু, বনলতাকে একখানা চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছিল।'

লিখলে আজকেই সে পাবে, তারপর উত্তরের জন্য দু-এক দিন অপেক্ষা করা যায়।

এ রকম অনেকবারই লিখেছেন তাঁকে, তিনিও উত্তর দিয়েছেন, তারপর বোর্ডিংয়ে গিয়ে শ্লেটে নাম লিখে ডাকলে নেমে এসেছেন বনলতা,

তারপর দু-এক ঘণ্টার কথাবার্তা। জীবনে এ ধরনের কথাবার্তা অনেকবারই হয়েছে দুজনের।

তারপর মনে হয়েছিল, কথা বলার দরকার নেই।

একটা কার্ড লিখে দিলে সবই সম্ভব, আপনি জানেন তা, কিন্তু বনলতাও তো লিখতে পারতেন আপনাকে। তিনিই বা লিখলেন না কেন?

আপনিও লিখলেন না আজ আর।

কয়েক দিন আগে খুব বেশি রাত করে ঘুমিয়ে পড়ার পর স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেখেছিলেন যে, বনলতা আর আপনি চেষ্টা করছেন পরস্পরের ভুল ভাঙাতে—বলছেন একে অন্যকে, জীবন কদিনেরই বা! মিছেমিছি এমন মুখ ফিরিয়ে থাকা কেন। তারপর দুজনে মিলিত হতে যাচ্ছিলেন—

কিন্তু স্বপ্ন গেল ভেঙে।

জেগে উঠে ভাবলেন, এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন একটা ঠাট্টার গিটকিরি মাত্র, এই পৃথিবীতে বাঁচাটাও তাই যেন অসম্ভব।

কিন্তু বাঁচলাম তো—ভাবলেন আপনি।

আজও বাঁচা!

এই সবই লিখেছেন আপনি। আমরা পেয়ে যাই আপনার বনলতাকে। তিনি পড়েন ডায়োসেশন কলেজে।

যখন আপনি এ কথা লিখছেন, যখন আপনার জীবনের এমনি বেকারত্বভরা দুর্বিষহ দিনরাত, তখন কে পড়তেন ডায়োসেশন কলেজে?

হ্যাঁ, শোভনাই পড়তেন তখন।

কাজেই আমরা আমাদের বনলতাকে পেয়ে গেলাম, জীবনানন্দ। শোভনা ওরফে বেবি। আপনার ওয়াইকেও পেলাম। বেবিই শোভনা, তিনি বনলতা, তিনিই ওয়াই।

তবু যেন আমরা না ভেবে বসি যে, শোভনাই একমাত্র নারী, যাকে আপনি ভালোবেসেছেন।

চৌত্রিশ বছর নামের উপন্যাসটিও একেবারে আত্মজৈবনিক। এখানে আপনার কবিতার অশ্লীলতার জন্যে চাকরি যাওয়ার কথা আছে। কথা আছে আপনার প্রথম কবিতার বইটা আপনি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন, তা নিয়ে।

রমা নামের একটা মেয়ে আপনাকে (আসলে গল্পের নায়ককে, তবু

গল্পের নায়ক তো আসলে আপনিই) জিজ্ঞেস করছে, 'পাঁচ বছর আগে কাকে এই বইটি আপনি উৎসর্গ করেছিলেন? তিনি কোথায় থাকেন?'

আপনি ভণিতা না করে বলে দিয়েছেন, 'হয়তো কলকাতায়।'

'হয়তো কলকাতায়!'

'হয়তো।'

'তার সঙ্গে আপনার দেখা হয় না?'

'এই এক বছরের ভেতর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না—কলকাতায় কতবার আসা-যাওয়া হয়—সে তার বাসায় থাকে—আমি আমার মেসে থাকি—এক এক দিন ভাবি, তার বাসায় একদিন গিয়ে উঠে পড়ি যদি—তারপর কী হয় কে জানে!'

'এ রকম ভাবেন?'

'মাঝেমধ্যে ভাবি।'

'কিন্তু যাওয়া হয় না?'

'না।...মনে হয় ভালোবাসার থেকে দূরে চলে যাওয়াই ভালো—'

'সে জন্য তাকে ভুলতেও রাজি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি চান শান্তি?'

'এখন শান্তি ঢের প্রিয় জিনিস।'

'ভালোবাসার চেয়েও?'

'তা-ই তো মনে হয়।'

'জীবনে কি অনেক ভালোবেসেছেন?'

'অনেক না।...তিন-চারটি নারী আমার জীবনে—'

'এও অনেক না?'

'এ-ই কি অনেক?'

আমরা আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যাচ্ছি, প্রিয় কবি, এক, আপনার জীবনে ১৯৩৩ পর্যন্ত চারজন নারী এসেছিল, কিন্তু ৩৪ বছরে চারজন নারীকে আপনি 'অনেক' মনে করেন না, আপনার *ঝরা পালক* উৎসর্গের মেয়েটা শোভনাই, সম্ভবত তিনিই আপনার ওয়াই।

ডায়াসেশন থেকে পড়াশোনা শেষ করে শোভনা মজুমদার প্রথমে যান শিলংয়ের লেডি কিং স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে। বছর খানেক চাকরি

করেছিলেন, তারপর বিয়ে হয়ে যায় প্রকৌশলী সুহৃদ মজুমদারের সঙ্গে। তারপর থেকে শোভনা থাকতেন কলকাতাতেই, সেখানেও কমলা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াতেন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উদ্বাস্তু মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রকল্পের কাণ্ডারি হয়ে উঠেছিলেন।

আপনি যখন কলকাতায় গিয়ে চাকরি খুঁজছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না, সেই দিনগুলোয় আপনি মাঝেমধ্যে যেতেন শোভনার বাড়িতে। কী হতো সেখানে?

আজ বরিশালের বাড়িতে খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসে আপনি শাদা কাগজের দিকে অপলক চেয়ে আছেন। প্রকৃতিতে আজ রোদের ফোয়ারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল, দূরে একটা হরিয়াল ডাকছে ওয়াক ওয়াক, আপনার মন চলে যাচ্ছে কলকাতার দিনগুলোয়। দিবাস্বপ্ন বোনা আপনার নিত্যদিনের অভ্যাস। আপনি এখন কলকাতায়। যেন আছেন সেই মেসে। একেবারে পায়খানার কাছে ঘরটা। পশ্চিম দিকের জানালাটা একটা গলির ওপর। গলিটা দিয়ে কোনোমতে একটা মটরগাড়ি যেতে পারে, প্রায়ই যায়। আকাশের দিকে তাকানোর উপায় নেই, বড়বাড়ির দেয়ালগুলো আকাশটাকে আড়াল করে রেখেছে। নিচে ধোপাবস্তি, দিনরাত সেখান থেকে আসে খিস্তিখেউড়, গলির ওপরে নোংরা কাপড়ের স্তূপ, তার ওপরে ধোপাদের বাচ্চারা খেলছে, কারিগররা এসে বাচ্চাদের পিটিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, কয়েকটা গাধার পিঠে কাপড়ের বস্তা চাপানো হলো। তাদের মেয়েরা সারাদিন ধরে কাপড় স্ত্রী করে চলেছে।

আর আপনার নিজের পকেটে পয়সা নেই, সারা দিন চাকরি খোঁজার নামে জুতাক্ষয় করা ছাড়া কোনো কাজ নেই, কী করবেন আপনি আজ? তার চেয়ে যাওয়া ভালো শোভনাদের বাড়িতে। ওর স্বামী বড় চাকরি করেন, কোনো একটা ছোটখাটো কাজ কি জুটিয়ে দিতে পারেন না তিনি? এই চাকরি প্রার্থনারও গ্লানি আছে, কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা শোভনার সঙ্গে তো দেখা হবে একবার! শোভনার সঙ্গে কথা বলে যে আপনার ভালো লাগে তা নয়, কিন্তু কেবল সৌন্দর্যের ইন্দ্রজালেই কি সে আপনার কৈশোর যৌবনের প্রথম প্রত্যূষকে অভিভূত করে রাখেনি। আজও না হয় সে-কারণেই যাবেন।

আপনি গেলেন শোভনার ওখানে। বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন।

আপনাকে বসতে দিলেন। আপনার জন্যে চা বানিয়ে আনলেন তিনি। বললেন, মিলুদা, তোমার জন্যে চাকরিটার চেষ্টা ও খুব করেছিল। কিন্তু হলো না। একজন মুসলমানের হয়েছে চাকরিটা।

আপনি ব্যথিত হলেন। কিন্তু নিজের বেদনাটা প্রকাশ করলেন না।

শোভনা বললেন, মাত্র ষাট টাকার চাকরি। ও দিয়ে কী হতোই বা তোমার?

'চাকরিটা হলে আমি একটা ফ্লাট নিয়ে নিতাম শহরের একটু বাইরে। তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো থাকতাম।'

'কী করে। ও কত মায়না পায় তুমি জানো মিলুদা?'

'অনেক। হাজার, বারোশ। কিন্তু ধরো ওর চাকরি চলে গেল, কী হবে তোমাদের। কত ইন্সুরেন্স, কত ব্যাংক ব্যালান্স, কিন্তু তা সত্ত্বেও অগাধ জলে ভাসতে। আর আমার দিকে দেখো। আজ ১২ বছর আমার চাকরি এই আছে এই নেই। এই করে করে আমি খারাপটা আছি কী?'

'ভালো আছ খুব, মিলুদা? একে ভালো থাকা বলে?'

'নিশ্চয়ই। আমি আর্টিস্ট না? আর্টিস্টদের এই রকম থাকাটাই ভালো থাকা। কাগজে আমার কবিতা বেরুচ্ছে। বুদ্ধদেব বসুর নাম শুনেছ? অনেক বড় সম্পাদক ক্রিটিক। আমার প্রশংসা করে লিখছেন। বই বেরুল। আমি তো এই জীবনই চাই বেবি।'

'তাহলে আর এই শহরে চাকরির খোঁজ করছ কেন। তোমার বরিশালে চলে যাও। সেইটাই তো তোমার জন্যে ভালো জায়গা।'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'চলো।'

'মনে পড়ে এক দিন বকমোহনার নদীর পাড়ে ভাঁট শ্যাওড়া জিউলি ময়নাকাটা আলোকলতার জঙ্গলে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম; বাড়ি তোমাদের আধ ক্রোশ দূরে সেখান থেকে; তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে 'খুব পারব চিনে যেতে—কতবার গিয়েছি!'—কিন্তু একবারও যাওনি, আম কাঁঠাল বাঁশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে। তারপর তোমাকে একটা পাৎলা সরপুঁটির মতো কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইর মত নদী ভেসে এলাম আমি। সেই নদী—জলের গন্ধ—রাত—অন্ধকার—নক্ষত্র—ভিজে বালির চর—তোমার ঠান্ডা শরীর কত দিন আমার হৃদয়ে শাসন করেছে—কিন্তু

আজ সেসব ঘটনা ব্যাপারের পুনরাভিনয় তো দূরের কথা—পুনরুক্তিও অত্যন্ত অন্যায়।

—কেন?

—সে পাড়াগাঁর জীবন তুমি কোনো দিন ফিরে পাবে না—অন্তত তেমন করে কিছুতেই না; কিছুতেই না। আমিও তাই গাঁয়ের পথে আর ফিরে যাই না, ভাবতেও চাই না পাড়াগাঁ কেমন—সেই তেলাকুচো ফণিমনসা বনধুঁধুল কোন অন্ধকারে কোন জ্যোৎস্নায় কত দূরে চলে গিয়েছে।... আমরা আর সেখানে নেই... কী হবে সেসব দিয়ে? কলকাতার মেসের জানালার ভেতর থেকে তাকিয়ে যখন দেখি একটা পাতাশূন্য শিমুলগাছের লাল ফুলগুলো সবে ফুটল, তখন যে আক্ষেপ যে গ্রামলোলুপতা আমাকে পেয়ে বসতে পারত নতুন জীবনের প্রয়োজনের কাছে সেসবকে উপহাস্যাস্পদ করে তোলাই ঠিক মনে করি—অনেক দিন থেকেই মনে করে আসছি; নতুন জীবন—নতুন প্রয়োজন চাইনি আমি যদিও,—কিন্তু সেগুলো যখন ঘাড়ে চেপে বসেছে তখন আমাকে হড়কাতে দেখবে না নিশ্চয়-

যে মধু হারিয়ে গেছে তা গেছে—তা যাদের জন্য তাদের জন্য শুধু, কিন্তু কলকাতার হৃৎপিণ্ডের থেকেও কলতানি বের করব না শুধু, যে কিছু রস সম্ভব—প্রয়োজনীয় গ্রহণ করা।'

—না, চলো না পাড়াগাঁয়ে যাই...

—কোন্ পাড়াগাঁয়?

—যেখানে ছিলাম আমরা-

—আর সেই বকমোহনার নদীর ধারে? ভাঁট শ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে?

—হ্যাঁ, সেখানেও—

অসম্ভব।

—অনেক দিন আমি ভেবেছি যাব।

আপনি মাথা নেড়ে বললেন—কী করে যাবে?

—কেন?

—তুমি আবার ফিরে আসতে চাইবে যে?

—ফিরে আসব না কেন?

—কেন ফিরে আসবে?

—কেন আসব না?

—তোমাকে নিয়ে সেই বকফুলা বনধুঁধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভেতর গেলে আমি তো আর ফিরে আসতে পারব না। কিন্তু কথা হচ্ছে—যা ছিলাম আমরা তা নেই আমরা—। তোমার যখন একটু বেড়িয়ে আসবার সাধ—মানুষ যে লোভে তাজমহল দেখতে যায়—ঠিক তেমনি একটা ফরমাস মতো ট্রিপে খানিকটা সময়োপযোগী ভাবপ্রবণ হয়ে; হয়তো চোখের জল ফেলবে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, চুমো দিতে দেবে—কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবেও হয়তো—হয়তো আর ফিরেও যেতে চাইবে না—হয়তো ব্যবহার করতে দেবে তোমাকে-কিন্তু সেসব একটা দুপুরের জন্য শোৎনী, পাড়াগাঁর মাঠ-জঙ্গলের আচ্ছন্ন দুপুর বড় মারাত্মক—কিম্বা একটা সন্ধ্যা—একটা রাতের জন্য। পরদিন ভোরেই তুমি এক সাঁতারে বারো-চৌদ্দ বছরের ওপারে—চলে যাবে; কে তোমাকে ধরতে পারবে? মেয়েরা যখন পরিবর্তিত হয় কেউ তাদের নাগাল পায় না। আমি নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারি—অত্যন্ত স্থায়ীভাবে; তুমি ট্রিপের ফুর্তির জন্য শুধু। মেয়েদের ও পুরুষদের ভেতর এই তফাৎ।

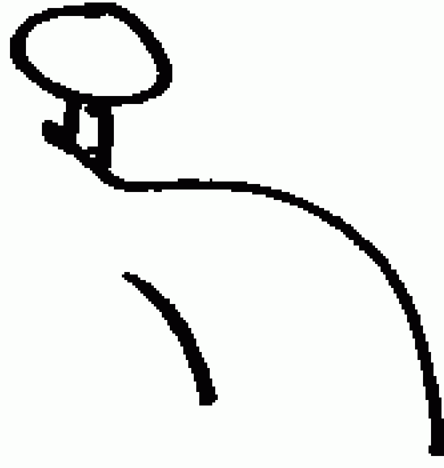
আজকের দুপুরের জন্য অন্তত শোভনা অন্য রকম হয়ে গেছে। আজকে আপনি তাকে পুরোপুরি নিজের যে কোনো প্রয়োজনে লাগাতে পারেন—সে জন্য তিনি প্রস্তুত—ব্যাকুল, কিন্তু এই সোফার ওপর?—বকমোহনার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে?

ভাবতে গেলেও ব্যথা—ভাবতে গেলেও ব্যথা।

দুপুরবেলা এইসব কী ভাবছেন আপনি!

কলেজের অধ্যাপকের এ কোন দেশি রোমান্টিকতা?

না। একটা গল্প লিখে ফেলবেন আপনি। আসলে গল্পেরই প্লট ভাবছিলেন। *গ্রাম ও শহরের গল্প* লিখতে বসে গেলেন। খুব ছোট ছোট বাঁকা হরফে লিখতেন আপনি। মনে হতো সারি সারি কালো পিঁপড়ে। চোখে চাপ পড়ত। উবু হয়ে বসে লিখতেন, ঘাড় গুঁজে। কাউকে আপনার নোট খাতাগুলো ধরতেও দিতেন না। নায়কের নাম দিলেন সোমেন, নায়িকার শচী। লেখা এগিয়ে চলল। রোদ মরে আসছে। ছায়ারা লম্বা হচ্ছে। গল্পটা তবু শেষ হচ্ছে না।



আরও দূর অন্ধকারে

বলিল অশ্বত্থ ধীরে: 'কোন্ দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এইসব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছো চ'লে পাই নাকো টের!
বোচকা বেঁধেছ ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো,—এই তো সে দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজও আহা তাহাদের কথা মনে হয়!—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এইসব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিলো ঋণ;
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন!

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না?'

(বলিল অশ্বত্থ সেই, *মহাপৃথিবী*)

জীবনানন্দ বাবু, এই কবিতা তো আপনিই লিখেছিলেন। চিরটা কাল এই ধানসিড়িটির তীরটাকেই সবচেয়ে মনোরম স্থান, সবচেয়ে শান্তির নীড় বলে জেনে এসেছেন আপনি। বাংলার বাইরে যত ভালো চাকরিই হোক না কেন, আপনি করতে চাননি, বহুবার করতে যানওনি। তবুও আপনাকে একদিন বরিশালের পাট চুকেবুকে দিতে হলো। প্রথমে বিএম কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। আপনার সঙ্গে আপনার পরিবারও ছিল। আপনারা উঠেছিলেন অশোকানন্দের ল্যান্সডাউন রোডের বাসায়। ভয়ঙ্কর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ। আপনি *স্বরাজ* পত্রিকা থেকে ফিরছেন ক্রীক রো দিয়ে। হঠাৎই রাস্তার লোকেরা দৌড়াতে শুরু করে। প্রতিটা বাড়ির দরজা-জানালা দুমদাম হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা মিলিটারি ট্রাক ছুটে আসে আর আপনারই সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'আর ইউ হিন্দু?'

'ইয়েস।'

অফিসারটি বন্দুক তাক করে রেখে বলেন, 'আই থিংক ইউ আর দি রিং লিডার অফ দিস এরিয়া। জাস্ট গেট অন।'

তো রিং লিডার বাবু, আপনাকে ওরা ধরে নিয়ে চলল থানায়। অনেকক্ষণ লাগল সেখানে পৌঁছাতে। অনেকক্ষণ বসিয়েও রাখল আপনাদের। ওসি থানায় ছিলেন না। তিনি না আসা পর্যন্ত আপনাদের ভাগ্য স্থির হচ্ছে না। তারপর যখন ওসি এলেন, দেখা গেল, তিনি আপনার দিকেই হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন, স্যার আপনি। করেছে কী এরা?

বিএম কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, মুসলিম সে, এখানকার ওসি। ওসি সাহেব আপনাকে নিজে ট্রামে তুলে দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। বারবার করে মাফ চাইলেন।

বিএম কলেজের চাকরিটা আপনার ঠিক ভালো লাগছিল না।

দু মাসের ছুটি শেষ হয়ে গেলেও আপনি আর ফিরে এলেন না।

বরং *স্বরাজ* পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সম্পাদনার কাজে যোগ দিলেন।

বিএম কলেজ থেকে ছ মাসের বিনাবেতন ছুটি নিয়ে ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে আপনি বিদায় জানালেন আপনার জন্মস্থান বরিশালকে। তখন অশ্বত্থের শাখা কি তুমুল প্রতিবাদ করেছিল জীবনানন্দবাবু? আপনার নিশ্চয়ই

মনে পড়ে গিয়েছিল, এই সর্বানন্দ ভবন আপনার চোখের সামনেই বলতে গেলে গড়ে উঠেছে, এখানকার গাছগুলো আপনার নিজের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন একটু একটু করে বড় হয়েছে। আপনার জন্মের পরই যে আলেকান্দা থেকে চলে এসে বগুড়া রোডের বাড়িটা করা হয়।

কীর্তনখোলার স্টিমার ঘাটে জাহাজে উঠলেন। সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মা। জাহাজ ছাড়বে। বারবার সাইরেন বাজাচ্ছে। মা এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। আপনিও। অন্ধকারে বুক চিরে এগিয়ে চলল জাহাজ। পেছনে ঘাটের আলো। আপনার মায়ের চোখে-মুখে এসে পড়ছে সেই আলোর আভা। আপনি দেখতে পেলেন, দু চোখের নিচে অশ্রু দূরবর্তী আলোয় দুটো স্বর্ণবিন্দুর মতো ঝুলে আছে মায়ের গণ্ডদ্বয়ে। আপনার বুকের ওপরে পাথর চেপে বসছে, এই বাংলা ছেড়ে, এই নদীতীর, পায়ে চলা পথ, এই ভেজা মেঘের দেশ ছেড়ে আপনি কোথায় চলেছেন? কোন্ অজানায়।

কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডের বাসায় ছোটভাই অশোকানন্দ দোতলায় ওঠেন, আপনি ওঠেন নিচতলায়। পরে ভেবুল অফিস থেকে বাড়ি পেয়ে দোতলাটা ছেড়ে দিলে আপনিই হয়ে ওঠেন ওই বাড়ির ভাড়াটে। আপনার মা কুসুমকুমারী দাশও আপনার সঙ্গে থাকতেন। তিনিও আপনার মতোই সারাক্ষণ ভাবতেন বরিশালের বাড়িটার কথা, কলকাতাতে আপনারা স্থায়ী হবেন এটা তিনি কখনো চিন্তাও করতে পারতেন না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, "এখন তো আপনি কলকাতারই লোক। আপনি আর কলকাতা ছাড়ার কথা ভাববেনই না। কলকাতার বাইরে জমি কিনে কুঁড়ে বেঁধে থাকলেও থাকা উচিত আপনার।'

শুনে আপনার মা ঘোরতর আপত্তি জানালেন। "কী বলিস। বিএম কলেজের চাকরিটা ছাড়বি তুই? বাপ-ঠাকুরদার ভিটে আছে জমি আছে বরিশালে, সেসব ছেড়ে তুই ওয়েস্ট বেঙ্গলে জমি কিনবি? তোর বাবা-ঠাকুরদারা কি খারাপ ছিলেন? তাদের ভিটেমাটি কি কেউ ত্যাগ করতে পারে?"

মাঝেমধ্যে কলকাতায় বসে আপনি ভাবেন বরিশালের দিনগুলোর কথা। *কলকাতার চেয়ে মফস্বলের প্রকৃতিলোক ঢের ভালো লাগে আপনার। সেই সব মানুষদেরও ভালো লাগে—মফস্বলের গ্রামপ্রান্তর থেকে উপচে পড়ে যে-সব মানুষ—কার্তিকের বিকেলের রোদে, চোত-বোশেখের শেষ*

রাতের ফটিক জলের মতো জ্যোৎস্নায়। কিন্তু বিএম কলেজ বড় অপমানিত করছিল আপনাকে। লাইব্রেরিতে যখন কোনো নতুন বই আসত, সেই মুহূর্তটা খুব ভালো লাগত, আর ভালো লাগত অবারিত প্রকৃতি, কলেজের রাস্তা থেকে পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে গেলেই টিটি প্রান্তর, ঝিল, কানসোনা মধুকূপি পুরথুপি ঘাস, শরের বন, কাশবন আর কখনো কখনো দু-একটা অনিন্দ্য নারীমুখ। কিন্তু সেই তো সব নয়।

আপনার *জলপাইহাটি* উপন্যাসের নিশীথবাবুর মতোই আপনার অবস্থা। আপনি যে পাকিস্তান ছেড়ে ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে চলে এসেছেন, সেটা অন্যরা বলাবলি করতে পারে, আপনার নিজের কোনো ধারণা নেই, কোনটা ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন, আর আপনি এতদিন যে জায়গাটায় ছিলেন সেটাই পাকিস্তান। পাকিস্তান নয়, ইউনিয়ন নয়, কোনো রাজনীতি নয়, আপনাকে বায়ুভূত করেছে অন্য জিনিস। অনেক দিন থেকেই আপনি কলকাতায় একটা কাজ জোগাড় করবার চেষ্টা করে আসছিলেন। সেটার কারণ কবিতার রাজধানীতে থাকা, রাজনীতির রাজধানীতে থাকা নয়।

কলকাতার দিনগুলো যে খুব ভালো যাচ্ছিল তাও নয়। আপনি এই শহরে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ ছিলেন। আপনার মা খুব ভালো বক্তা, আপনার বাবাও একজন চমৎকার কথক, কিন্তু আপনি ঠিক গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না। ক্লাসেও খুব যে ভালো পড়াতেন তা নয়। অন্যরা সব রাজনীতি, অর্থনীতি, নিলাম, ছাপাখানা, লে-আউট ডিজাইন এমনকি দরজি দোকান নিয়েও কত কী বলতে পারে—আপনি এইসব পারেন না, ভেবে ভেবে আপনি মরমে মরে যেতেন। আপনি ভাবতেন, আমি সেই ধাতেরই না, আপনার ধাত হলো নির্জনতার, আপনি নিজেকে হারাতে পারেন কেবল প্রকৃতির বুকে, কখনো কখনো মানুষের কোনো অপরূপ শিল্পসৃষ্টিতে। কফি হাউসে যান আপনি, কে আপনার দিকে তাকাল, কে তাকাল না, আপনার মুখের কোণে খাবার লেগে থাকল কি না, কে কফিতে বেশি পরিমাণে দুধ ঢেলে নিল, কে বারবার কফি ঢেলে নিচ্ছে পেয়ালায়—এইসব খেয়াল করছেন আপনি। নিজে সহজ হতে পারছেন না।

এইবার আপনাকে পেয়ে বসল নতুন ভাবনায়। আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। আপনার দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। আপনি নিজেই আঙুলে হিসাব

কষেন, আমার বয়স কত হলো, ৪৭/৪৮ নাকি ৪৯। ৭০ হতে এখনো ২১ বছর বাকি। আপনি আপনার বাবাকে দেখেছেন বৃদ্ধ হতে, বার্ধক্য কী ভয়াল নিষ্ঠুর, মানুষ কত অসহায় তখন, বাবা চোখে দেখতেন না, কাঁপতেন, ভুলে যেতেন, কিছুই মনে করতে পারতেন না। না, ৬০ বছর হওয়ার আগেই আমার যা কিছু করবার করে ফেলতে হবে, ভাবতেন আপনি। তলস্তয় বা গ্যেটের মতো মহান কিছু করতে হলে আর সময় কই? কিন্তু আপনি ভাবছেন, আপনার অভিজ্ঞতা নেই ততটা, আর অর্থনৈতিক সচ্ছলতাও নেই যে এক মনে এক ধ্যানে একটা বড় কিছুতে নিমগ্ন হতে পারবেন, তাহলে কি আপনার উপন্যাস লেখার চেষ্টা না করাই ভালো? তাহলে কি আপনার উচিত শুধু কবিতা আর সমালোচনাতে নিবিষ্ট থাকা?

এই সময় আপনার মনে হয়, আপনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন, শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন মাস্টারবেশনের কারণে। আপনি দিনলিপিতে লিখছেন, হেরোডিয়াসের মেয়েরা (ওয়াই আর জে.ওয়াই) আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, মুচড়ে দিচ্ছে, তেতো করছে, সফল হতে দিচ্ছে না। অথচ এখন, যখন আপনি মহাকালের কাছে একটা বড় কোনো সাহিত্যকীর্তি রেখে যাওয়ার কথা ভাবছেন, তখন ওই মেয়েগুলোকে কত তুচ্ছই না মনে হচ্ছে। ওরা আপনার এখানে আসে হঠাৎ হঠাৎ, আপনি তার বদলে তাদের ওখানে যান না, ওরা এখানে এসে ভেবুলের সঙ্গে যত আগ্রহ নিয়ে কথা বলে, আপনার ব্যাপারে তাদের সেই আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না, আপনারও মনে হয় ওদের ওখানে যান, কিন্তু আবার আপনি দমে যান যখন ভাবেন আপনার চেহারা খারাপ, বেশভূষা মলিন, আর ওদের ওখানে আছে ওদের আত্মীয়রা। আগের রাতের আত্মরতি, নিজের হাতে করা অনৈতিক কাজ আপনাকে অপরাধবোধে বিদ্ধ করে। এর চেয়ে ভালো লেকের ধারে প্রকৃতির বুকে ঘুরে বেড়ানো। এই সবই আপনি লিখে রেখেছেন আপনার ১৯৪৬-৪৭ সালের দিনলিপিতে।

ওয়াই আর জে.ওয়াইয়ের সঙ্গে আপনার রাস্তাঘাটেও দেখা হয়, এখানে-সেখানে কত জায়গায়, কিন্তু তারা আপনার চেয়ে অন্যদের দিকে মনোযোগ দেয় বেশি, তারা বিদায় নেয়ার সময় আপনার খোঁজও নেয় না, আপনার মনটা ব্যথায় ব্যথায় আকীর্ণ হয়ে যায়।

আহা, এমন নারী যদি পাওয়া যেত, যাদের কাছে সব সময় যাওয়া

যায় আর সময় কাটানো যায়, তাহলে এই মেয়েদের আপনি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তারা কোথায়? হ্যাঁ। বাসে ট্রামে এই রকম নারীমুখ আপনার নজরে পড়ে—কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে?

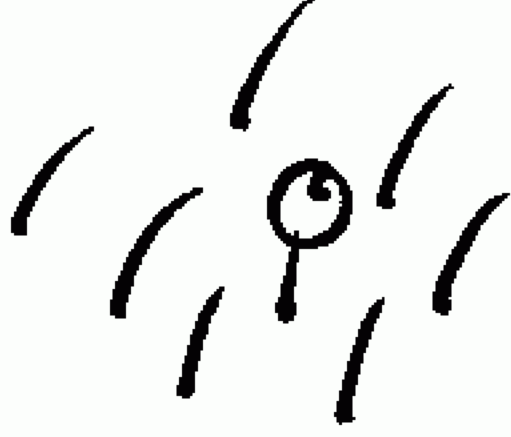
আপনার এই প্রবল দৈহিক কামনার জন্যে আপনার মনে হবে আপনার ত্বকচ্ছেদই দায়ী। বারবার মনে হবে, কী অর্থহীন নিষ্ফল হেরোডিয়াসের কন্যাদের সঙ্গে আপনার এই যোগাযোগ। মনে হবে, সেপ্টেম্বর অক্টোবরের রাতে জে.ওয়াইকে ভেবে আপনি হস্তমৈথুন করেছিলেন সোফায়, তখন আপনার সামনে ছিল স্টেইনবেক। অন্যরা ছিল ঘুমিয়ে। আজ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে এসে এসবকে কী হৃদয়হীন অপচয়ই না মনে হচ্ছে। জে.ওয়াই কখনো আসে না, যদিও বা আসে, স্বামী বা সন্তান সঙ্গে নিয়ে আসে, এসে খোঁজ করে ভেবুলের, আর আপনার প্রতি তার সেই পুরোনো, অতিচেনা, স্বাভাবিক শীতলতাটুকুনই কেবল প্রদর্শন করে। জে.ওয়াইকে ভেবে মাস্টারবেশন শেষতক কেবল আপনাকে বুড়িয়ে দিয়েছে।

এই ওয়াইটা কে, আমরা হয়তো সেটা এরই মধ্যে জেনে গেছি, বলছি যে শোভনাই ওয়াই, কিন্তু জে.ওয়াইটা কে, সেটা আমরা জানি না। গবেষকরা সেটা উদ্ধার করতে পারেননি। আর কেন তারা হেরোডিয়াসের কন্যা, সেটাও বলা ভার।

বড্ড হতাশা এসে গ্রাস করে আপনাকে। আপনি কি আর এই জীবনে বরিশাল আর বিএম কলেজের চাকরি আর ছাত্রছাত্রীদের ফিরে পাবেন? *স্বরাজ* পত্রিকার চাকরিটাও একই রকম নরক বলে মনে হচ্ছে আপনার। ওরা বলে, সাংবাদিকতার আপনি বোঝেনটা কী? আর এই বাড়িটা মনে হচ্ছে একটা ভয়াবহ দম আটকে ফেলা কারাগার। পরিবারটাকেও টেনে এনেছেন এই কারাগারে, যারা আপনাকে উপশম দেবে না, বরং একই যন্ত্রণায় দগ্ধ হবে ও দহন করবে। মা মারা যাচ্ছেন। মঞ্জু তার নিজের জগৎ নিয়ে নিমগ্ন। 'সাহিত্যিক হতাশা, প্রেম, হেরোডিয়াস কন্যারা, বনলতা সেন, কাল্পনিক নারীরা, বাসে দেখা মেয়েরা—সর্বত্র শুধু হতাশা আর ব্যর্থতা।' তাই আপনি ঠিক করেছেন, ১৯৪৬-৪৭-এ আপনার দিনলিপির বাহাদুর-মার্কা রুলটানা খাতায় আপনি লিখে রেখেছেন, স্ত্রী কন্যা পুত্রকে নিয়ে কোনো এক মহাসমুদ্রের ঢেউয়ে ডুবে মরবেন। ভাবছেন, কীভাবে তখন তারা নিজেদের

মতো করে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে? তবে এই কাণ্ডের আগে আপনাকে ভালো কিছু বই প্রকাশ করে যেতে হবে। আর আত্মহত্যার জন্যে কোনো অহিংস পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ। আর একা একা মরা যাবে না। ওদেরকে নিয়েই মরতে হবে। আপনার মনে পড়ে, একবার এক স্কুলশিক্ষক আত্মহত্যা করেছিলেন সমস্ত পরিবার-পরিজন সমেত, কুড়াল দিয়ে সবাইকে মেরে নিজে মরেছিলেন, এই পদ্ধতি একদম ঠিক নয়। মহাসমুদ্রে ভেসে যাওয়াটাই ভালো। তবে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন বেছে নেয়া উচিত। সকালের চেয়ে হয়তো বিকেলের দিকে মরাটা শ্রেয়।

কী ভেবেছিলেন এইসব আপনি, জীবনানন্দ দাশ? কেন এতটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন আপনি? আপনি কি টের পাচ্ছিলেন না তরুণেরা আপনার কবিতার দুর্মর রকমের ভক্ত হয়ে উঠছিল? অবশ্য বুদ্ধদেব বসুও আপনার নতুন রাজনীতিসচেতন কবিতাগুলোকে আর পছন্দ বা প্রশংসা করে উঠতে পারছিলেন না। বামপন্থীরা আপনাকে পলায়নবাদী বলে খুব ঝাল ঝাড়ত তখন। স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কোনো দিনও বনেনি। *স্বরাজ* পত্রিকার চাকরিটা একদমই ভালো লাগছিল না, আর সেটা আর্থিক সংকটে পড়লে আপনি নিজেই ছেড়ে দেবেন সে চাকরি। কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যার কথা কেন ভেবেছিলেন। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাকে লোকে যখন বলেছিল আত্মহননেচ্ছার কবিতা, আপনিই তো আপত্তি জানিয়েছিলেন। অশ্বত্থের শাখা কি এখন একযোগে দুলে উঠছে না জীবনানন্দ বাবু? বলছে না, কবি, তুমি এই রকম ভেবো না। অশ্বত্থের ডালে বসে থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা বলছে না, চমৎকার, ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার? বলছে না, জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার এখনো অপেক্ষা করে আছে আপনার জন্যে, সকলের জন্যে?



পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে

আপনি বলেছিলেন, প্রেমের চেয়ে শান্তি বেশি কাম্য আপনার কাছে। সেই শান্তিটাই পাচ্ছিলেন না আপনি। যেমন পায়নি আপনার *মাল্যবান* উপন্যাসের নায়ক মাল্যবান নিজে।

মাল্যবানও আপনার আত্মজৈবনিক উপন্যাসই বটে। আপনার স্ত্রী লাবণ্য দাশ, আপনার মৃত্যুর পর ছোট কাগজ *ময়ূখ*-এর কর্মীদের, যারা ছিল আপনার একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী, বলেছিলেন, 'বুদ্ধদেব এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তা হলে তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড় মাপের সাহিত্যিক ছিলেন; বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কী রেখে গেলেন, বলো তো', সেই লাবণ্য দাশ আপনার মৃত্যুর পর বহু বছর *মাল্যবান* উপন্যাসটা ছাপানোর অনুমতি দেননি।

কারণ হয়তো *মাল্যবান* উপন্যাসে আপনি দেখিয়েছেন, মাল্যবান শান্তি পায়নি।

নিচে আলাদা ঘরে শুত মাল্যবান। দোতলার ঘরে শুত উৎপলা, মাল্যবান দোতলায় গিয়েছিল একদিন মধ্যরাতে, তখন উৎপলা তাকে দিয়ে মেয়ের বিছানার মশারি গুঁজে নিয়ে বলল, *'যাও নিচে যাও।'*

'সেখানে গিয়ে কী হবে?'

'এ রকম কতক্ষণ বসে থাকবে শুনি—'

'তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলব—'

'দাঁতে ঠেকে যাবে জিভ বেশি কথা বলতে গেলে। দাঁতকপাটি হয়ে যাবে। দাঁতে চামচ ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে—ঢেঁকির পাড় দিয়ে খুলতে পারা যাবে

না আর—যাও সুড়সুড় করে সরে পড় দিকিন—উৎপলা পাশ ফিরে শুল।'

কী সব বলত মাল্যবানকে উৎপলা।

একদিন বলেছিল, 'একজন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমান ভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তাহলে এতটা দম আটকে আসত না আমার—।'

না, আপনি শান্তি পাননি ঘরে, শান্তি পাননি দেশে, দেশ ভাগ হয়ে গেল, আপনাকে আপনার প্রিয় স্থান ধানসিড়িটির তীর বরিশাল ছাড়তে হলো, আরেক দিকে *শনিবারের চিঠির* মতো ডানপন্থী আক্রমণে রক্তাক্ত হওয়ার বাইরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের মতো বামপন্থীদের নিষ্ঠুর কলম আপনাকে শিককাবারের মুরগির মতো শতচ্ছেদা করে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আগুনে ঝলসাচ্ছিল।

কিন্তু এরপরেও তো আপনি বেঁচেছিলেন আরও ৮ বছর। আর আপনি আত্মহত্যাও করেননি। যদিও আপনার দুর্ঘটনাটিকে অনেকেই সে রকমই বলতে চায়, তবু আমরা জানি যে আপনি কী ভীষণভাবেই না বাঁচতে চেয়েছিলেন। *স্বরাজ*-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনি বিপদে পড়েছিলেন বটে। টিউশনি করে, কাগজে লিখে, নানাভাবে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেছেন। আপনার স্ত্রীর অবশ্য একটা স্কুলের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে আপনার কবিখ্যাতি বেশ পোক্ত হচ্ছিল। *বনলতা সেন* নামটা তো আপনার জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি হয়ে উঠছিল। আর ছিল আপনার ওয়াই। তার সঙ্গে আবার যুক্ত হলো জে.ওয়াই।

হায়, কাকে ভালোবেসে গেলেন আপনি সারাটা জীবন? সেই যে *মহাপৃথিবী* বইয়ে প্রকাশিত কবিতায় লিখেছিলেন,

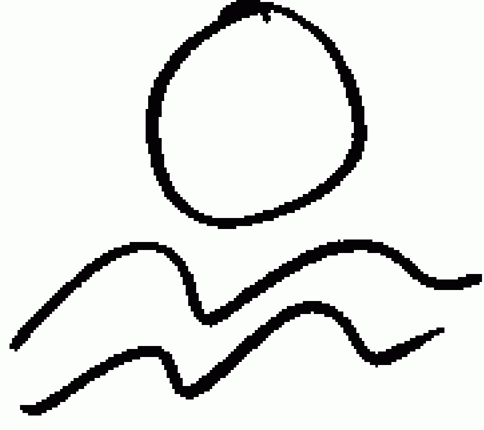
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চলে গেল যুবকের দল;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা;—এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু আহা ইহাদেরই কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চলে গেল যুবকের দল;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

আপনি সব সময় বধির নিশ্চল সোনার পিত্তল মূর্তিকেই কি ভালোবেসে গেছেন?

কলকাতার জীবন আপনার ভালো লাগেনি, আপনি সব সময়েই ফিরে যেতে চেয়েছেন সেই গাছে ঢাকা পাখপাখালির ডাকে ভরা জলজংলার দেশটাতে... শচী বা ওয়াই বা শোভনা বা বনলতা সেসবেরই একটা উপলক্ষ কিংবা হয়তো ওরাই লক্ষ্য, বরিশালের বাড়িটাই উপলক্ষ। আপনি অনেক দিন খুকুকে, আপনার বোন সুচরিতাকে বলেছেন, যদি আবার বরিশালের দিনগুলোয় ফিরে যাওয়া যেত... সুচরিতার ভাষায়, আপনার কাছে ভালো থাকার মানে ছিল বরিশালের মতো করে থাকা।

সেই ভালো থাকাটা আপনার হয়ে ওঠেনি। তবে জীবনের শেষ বছরটা ভালোই যাচ্ছিল, হাওড়া গার্লস কলেজের চাকরিটায় থিতু হয়েছিলেন, ভাদ্র মাসেই আপনার চাকরির বছরপূর্তি উপলক্ষে বার্ষিক ২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি ছাড়াও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বভাতা হিসেবে আরও ২৫ টাকা বিশেষ ভাতা বরাদ্দ করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারও আগের বছর মে মাসে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃপক্ষ আপনাকে সংবর্ধনা জানান মহাজাতি সদনে, আপনাকে *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের জন্য দেয়া হয় ১৩৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পুরস্কার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলের এক কবি সম্মেলনে আপনার পড়ার কথা ছিল একটা কবিতা, কিন্তু শ্রোতাদের অনুরোধে পড়তে হয়েছিল তিনটা, আর সম্মেলন শেষে আপনার হাত ধরে প্রবোধ সান্যাল বলেছিলেন, 'আপনি বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক!' কিন্তু আপনার মনের সংশয় তাতে দূর হয়নি। একদিন সন্ধ্যাবেলা লেকের ধারে বসে আপনি সুবোধ রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা এত যে লিখেছি, একটা কবিতাও কি সুপ্রিম পোয়েট্রি হয়নি, যা আমার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে পারে?' আপনার ভক্ত জুটে যায় এদিকে ওদিকে, পূর্বপাকিস্তান থেকে শামসুর রাহমান, কায়সুল হকও কলকাতায় গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটাকে কর্তব্য বলে জ্ঞান করেন। বিশেষ করে *ময়ূখ* পত্রিকার ছেলেরা আপনার একান্ত অনুগত ভক্তের মতো আপনার কবিতা আর সঙ্গের

লোভে ঘুরতে থাকে আপনার বাড়ির আশেপাশে। শুধু একটাই সমস্যা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়, আপনার বাড়িতে সাবলেট ছিলেন বীমা কোম্পানিতে কর্মরতা এক মহিলা, তিনি সন্ধ্যাবেলা তার ঘরে আসর বসাতে শুরু করেন, নানা ধরনের লোক আসতে থাকে বাসায়, আপনি কিছুতেই তাকে বাসা থেকে উচ্ছেদ করতে পারছিলেন না, আপনার পরিচিত ক্ষমতাবান প্রত্যেককে আপনি বলছিলেন এই উপভাড়াটেকে উঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে, কিন্তু পারছিলেন না, কারণ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিজেই আসতেন ওই সান্ধ্যবাসরে। শেষের দিকে এই বাড়ি প্রসঙ্গ—হয় উপভাড়াটেকে উঠিয়ে দেয়া, নয়তো নিজেই আরেকটা বাসায় গিয়ে ওঠা—পরিণত হয়েছিল আপনার একমাত্র আচ্ছন্নতায়। আপনার সমস্ত শান্তি কেড়ে নিয়েছিল এই বাড়ি-প্রসঙ্গ।



আমারে দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিল

কিন্তু জীবনের শেষ কটি দিনে আপনি সাহচর্য লাভ করেছিলেন 'শান্তি'র। এখন আমরা সেই গল্পটাই করব।

১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর। আগের দিনে আকাশবাণীতে ছিল কবিতা পাঠের আসর। আপনিও সেখানে গিয়েছিলেন। আপনার দৃষ্টি তখন ছিল চন্দ্রগ্রস্তের মতো। আপনি বারবার করে বলছিলেন, 'প্রেমেন এল না?' প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আপনি খুঁজছিলেন ওই ভাড়াটে-বিভ্রাট থেকে মুক্তি লাভের কাজে সহযোগিতা লাভের আশায়। রেডিওর অনুষ্ঠানে পড়েছিলেন ওই বছর পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটা। কিন্তু কবিতায় আপনার মন ছিল না। ভীষণ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল আপনাকে। আপনার দৃষ্টি যেন এই জগতে নেই। পরের দিনেও সেই অন্যমনস্কতাই আপনাকে গ্রাস করে রেখেছিল।

আর আপনি ১১ ও ১২ অক্টোবর দু দিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন ছোটভাই অশোকানন্দ দাশের বাসায়, বাড়িতে কেউ ছিল না, গৃহপরিচারিকার কাছে আপনি জানতে চাইছিলেন, ওরা সবাই কই, খুকু, ভেবুল, নিনি, ওরা সবাই ভালো আছে তো, একটা ট্রাম একসিডেন্টের খবর শুনলাম! পরে ছোটবোন সুচরিতা ছুটে গেছেন আপনার বাসায়, কী হয়েছে দাদা? আপনি খুকুকে দেখে শান্ত হয়েছিলেন। বললেন, রাস্তা পেরোতে পেরোতে শুনলুম, সবাই বলাবলি করছে ত্রিকোণ পার্কের কাছে একজন ট্রামের নিচে পড়েছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। ভেবুলদের বাড়ির কেউ নয় তো! তাই জানতে গিয়েছিলুম। এখন তুই যখন ফিরে এসেছিস তো ওরাও নিশ্চয়ই ভালোমতোই ফিরেছে।

আপনি হঠাৎই হেসে উঠলেন কলস্বরে।

কিন্তু ১৪ অক্টোবর ঘটনা নিজেই ঘটালেন।

দক্ষিণ কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডের বাসায় ফিরে আসছিলেন লেকের ধারে সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে রাসবিহারী এভিনিউয়ে রাস্তা পেরোতে গিয়ে ট্রামের ধাক্কায় আহত হলেন, ট্রামের সামনে একটা জিনিস নাকি তখন থাকত গরু সরিয়ে দেয়ার জন্যে, সেটা দিয়ে সরানোর পরও আপনি ধাক্কা খান ট্রামের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, খানিক বাদে আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি কোথায়?'

উপস্থিত এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আপনি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই...'

'ও। তাহলে আমি এখন বাড়ি যেতে পারি?'

'হ্যাঁ। আপনার নাম কী?'

'জীবনানন্দ দাশ। ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড।'

বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। উঠেই পড়ে যান। জ্ঞান হারান। ট্যাক্সি আপনাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যায়।

২ নম্বর ওয়ার্ডের বারান্দায় জায়গা হলো আপনার। কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ পড়ল, মুখ ফুলে উঠেছে, ডান চোখের ওপরে ঢিবি মতন হয়ে গেছে, আপনি অস্ফুট আর্তনাদ করছেন, আপনার শিয়রের কাছে বসে আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন সুচরিতা দাশ।

আপনার ইদানীংকালের বৈকালিক ভ্রমণের সঙ্গী সুবোধ রায় খবর পেয়ে ছুটে এলেন আপনার কাছে। আপনার গায়ে হাত বোলালেন। ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি এনে আপনি বললেন, 'এসেছেন? কী সব হয়ে গেল...বাঁচব তো?'

আপনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, সেই কথাটাই বারবার করে মনে হবে আমাদের।

চতুর্থ দিনে আপনাকে যখন অনেক সুস্থ দেখাচ্ছিল, সেদিন সুবোধ রায় আপনাকে বললেন, 'ইউ লুক অলরাইট টুডে।'

আপনি বললেন, 'সত্যি ঠিক তো? আবার হাঁটতে পারব তো?'

সুবোধ রায় জবাব দিলেন, 'সারার আগে পারবেন বলে মনে হয় না।

সারার পরে পারার প্রশ্ন।'

শুনে আপনি সেই হাসিটা দিতে গিয়েও থেমে গেলেন।

না, আপনি আর কোনো দিনও হাঁটতে পারেননি।

কিন্তু শান্তিকে আপনি পেয়েছিলেন।

শান্তি মেয়েটি ছিল ছোটখাটো, তাঁর গায়ের রং শ্যামলা, তিনি বসতেন না একদণ্ড, সব সময় কিছু না-কিছু কাজ করতেন এই নার্সটি, কথা বলতেন খুবই কম। আপনার শুশ্রূষার জন্যে তাকে আনা হয়েছিল, ডিউটিতে এসেই শান্তি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আপনাকে নিয়ে, হাড়গোড় ভেঙে গিয়েছিল আপনার, ভেতরে হয়ে গিয়েছিল মারাত্মক ক্ষত, পাঁজরের অনেকটা হাড় ভেঙে থেঁতলে গিয়েছিল একেবারে।

আপনার তখন বেঘোর অবস্থা। জ্বরতপ্ত শরীর, চোখ বন্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাস ছোট হয়ে এসেছে, নাকে অক্সিজেনের নল, শান্তি নামের সেবিকাটি ভেজা তোয়ালে দিয়ে আপনার গা-মুখ মুছিয়ে দিলেন, চিরুনি দিয়ে আপনার চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন, আপনার অক্সিজেনের নলটা বের করে পরিষ্কার করে আবার স্থাপন করছেন যথাস্থানে, আর আপনার নোংরা বাসি কাপড়গুলো কী এক আশ্চর্য জাদুকরি প্রতিভায় বদলে দিলেন, আহত অনড় একটুখানি ভারী শরীরটা দু হাতের কোনটা দিয়ে আলগা করে তুললেন, কোনটা দিয়ে কাপড় পাল্টালেন, কেবল শান্তিই জানেন।

তারপর শান্তি জানতে পারলেন, এই পেশেন্ট একজন কবি। বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো বড় বড় লেখক কবিরা তাঁকে দেখতে আসছেন, কত বড় কবি তাহলে!

তখন থেকে শান্তি আর তাঁর কবির পাশ থেকে একচুলও নড়বেন না, একবারও বসবেন না, দাঁড়িয়েই থাকবেন, এমনকি কিছু খাবেনও না।

আপনি একবার রাতের বেলা চোখ খুললেন।

তখন পাশে ছিল *ময়ূখ* পত্রিকার সাহিত্যকর্মী আর মেডিকেল ছাত্র ভূমেন। ভূমেনকে দেখে আপনি বললেন, 'তুমি এখানে কেন, এই রাতের বেলা, খুকি তো নেই দেখছি, আমি কোথায় আছি বলো তো...?' খুকু, মানে আপনার বোন, সুচরিতা দাশ, যাকে প্রায়ই দেখা যেত ভূমেনের সঙ্গে...ভূমেন যাকে দিদি বলে ডাকত, ভূমেনদের দলের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন এই দিদিই...

ভূমেন বললেন, 'দিদিকে ডাকব? তিনি এখানেই আছেন।'

আপনি বললেন, 'না থাক। তার তো তমলুকে যাওয়ার কথা ছিল, যায়নি বুঝি—শরীর খারাপ...আচ্ছা আমি কোথায় আছি বলো তো, আমার কী হয়েছে...?'

শান্তি তাড়াতাড়ি মুখ এগিয়ে এনে বলেছিলেন, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি? কী অসুবিধে আমাকে বলুন, আমি দেখছি—'

আপনি বললেন, 'তুমি কে?'

শান্তি বললেন, 'আমি শান্তি, কেন। খুকু—খুকুর বন্ধু তো আমি—'

সে ছিল এক বারোয়ারি ওয়ার্ড। বিভিন্ন বেডে নানা রকমের রোগী। আপনি আবার চোখ বুজলেন। আস্তে আস্তে রাত বাড়লে বড় বাতিগুলো নিভিয়ে দেয়া হলো, নার্সরা তখন চলাচল করছেন হাতের টর্চের আলোয়, শান্তি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন আপনার পাশেই।

আপনি তখন চলে গেছেন অচেতনা আর অবচেতনার জগতে...

কী ভাবছিলেন আপনি, প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ। শান্তি নামটা কি আপনাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই শান্তির কাছে, হালভাঙা নাবিক দারুচিনি দ্বীপের সবুজ ঘাসের দেশ দেখতে পেলে যে শান্তি পায়।

শান্তি কাজ করে চলেছেন, আপনার পোশাক পাল্টানো, গা মুছে দেয়া, আপনার মুখ ধুয়ে দেয়া, জিভ পরিষ্কার করা, স্যালাইনের ব্যাগ খালি হলো কি না খেয়াল রাখা, ইনজেকশন দেয়া, ওষুধ দেয়া...

আরেকবার জেগে উঠলেন আপনি, আরেক রাতে—'আমি হাসপাতালে আছি তো? আমার কী হয়েছে?'

শান্তি বললেন, 'এমন কিছু নয়, আপনার সারা গায়ে ব্যথা আর একটু জ্বর, এই আর-কি—'

'তাহলে আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট দিন, ওতে আমার খুব কাজ হয়—'

'ভোর হতে বাকি আছে তো, হলেই দেব—'

আরও কিছু কথা বললেন, খুকুকে জিজ্ঞেস করলেন তমলুক থেকে সে কবে এসেছে, দিলীপ নামে ভূমেনদের এক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল বাসা

জোগাড় করে দেয়ার ব্যাপারে, তাঁকে দেখে বললেন, 'বাসার কথা যে বলেছিলুম, তার তো কিছু করলেন না।' মৃত্যুশয্যায় শুয়েও এই বাড়ি বদলানোর অবসেশন থেকে আপনি মুক্তি পাননি।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ থেকে চোখের পাতা বন্ধ রেখে বিড়বিড় করে বললেন, 'লিখে রাখো আজকের তারিখটা, আজ থেকে এক বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখন ভোর, না সন্ধে? আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানো? বনলতা সেনের পাণ্ডুলিপির রং।'

তাই তো আপনার দেখতে পাওয়ার কথা, বনলতা সেনের পাণ্ডুলিপির রং, সব পাখি তো এখন ঘরে ফিরবে, সব নদীও, ফুরিয়ে যাবে এ জীবনের সব লেনদেন, থাকবে শুধু আর কিছু নয়, অন্ধকার আর...? আর মুখোমুখি এক সন্ধেয় বসে থাকবার স্মৃতি—বনলতা সেনের।

আর আছে সেই দু দণ্ডের শান্তি।

এবং এই সেবিকা শান্তি।

এর মধ্যে *ময়ূখ* গোষ্ঠীর ছেলেরা শান্তিকে একটা বই কিনে দিয়েছে, সুচরিতা দাশের টাকায়, বইটা আর কিছুই নয়, *বনলতা সেন।*

দেয়ার আগে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে নিয়েছে, এ এমন একটা বই, এমন সব কবিতা, যাকে একবার ধরেছে, সে-ই সংক্রমিত হয়ে গেছে, করাপ্ট হয়ে গেছে।

সত্যই তা-ই হলো। শান্তিও করাপ্ট হয়ে গেলেন।

তিনি সারা রাত আপনার পাশে থাকেন, সকালে বেরিয়ে যান। একদিন সকালে বেরিয়ে খানিক পরে হাজির হলেন *ময়ূখ* গোষ্ঠীর ছেলেদের থাকার ডেরায়, যেখানে ছেলেরা থাকে মেস করে। *ময়ূখ* পত্রিকার ছেলেরা কোথায় থাকে, অনেক কষ্টে সেই ঠিকানা উদ্ধার করে তিনি এসেছেন।

বললেন, 'এত বড় একজন মানুষের জীবন-মরণ সংকটে আমি নার্সিং করার সুযোগ পেয়ে গেছি, একজন নার্স এর চেয়ে বেশি সৌভাগ্য আর কী কামনা করতে পারে—!'

তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'কী করে জানলেন জীবনানন্দ বড় মাপের মানুষ?'

শান্তি বলেন, 'আপনারা জানিয়ে দিলেন বলে—না দিলেও পারতেন—তবু দিলেন। যদি দিলেন, তাহলে আরেকটু ভালোভাবে জানতে

ইচ্ছে হলো বলে চলে এলুম।'

এইবার তিনি ব্যাগ থেকে বের করলেন বনলতা সেনের বইটা। বললেন, 'ভালো করে তো সব বুঝতে পারি না, তবু টানে তো এত টানে যে...কয়েকটা কবিতা অন্তত আমাকে পড়ে দিন, বলে দিন...'

ছেলেরা হতভম্ব।

উনি বললেন, 'এত বড় একজন মানুষ...বাঁচুন আর মরুন, আর তো এঁকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না। ওঁরা আমাকে টাকাকড়ি দিন বা না দিন, আমি তো প্রতি রাতেই ওঁর নার্সিং করতে চলে আসব...আপনারাও আসবেন, আমি জানি...'

ময়ূখ-এর ছেলেরা যেমন করে করাপ্ট হয়ে গিয়েছিল একদিন আপনার বনলতা সেনের কবিতা দিয়ে, তেমনি করে আরও একজন গেল...

তিনি আর তাঁর পারিশ্রমিকের টাকা নিতেন না, ডিউটি শেষ হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে চাইতেন না, আপনার মাথার কাছে তিনি রোজ সাজিয়ে রাখতেন তাজা ফুলের গুচ্ছ, ধূপের গন্ধে তাড়াতেন অসুখের গন্ধটুকুন, আপনার দাড়ি কামিয়ে দিতেন, আপনাকে ধবধবে পাঞ্জাবি পরাতেন একটুও ব্যথা না দিয়ে, গায়ে রাখতেন শাদা শাল, আপনিও বাধা দিতেন না, হয়তো আপনি এই অত্যাচারটা পছন্দ করেই নিয়েছিলেন, যদি আপনার কিছুমাত্র চেতনা অবশিষ্ট থেকে থাকে তা দিয়ে। শান্তির ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ত *বনলতা সেন* নামের কাব্যগ্রন্থটা, সেটা কেউ দেখে ফেললে শান্তি লজ্জা পেয়ে বলেছিলেন, 'রোজই ডিউটিতে আসার সময় ভাবি, ওঁকে আজ খুব ভালো দেখব, উনি হয়তো আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলবেন, আর আমি ওঁকে বলব, এই দেখুন, আপনার কবিতা পড়ি, ভালোবাসি। আমি আপনাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাব?'

'ওঁর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে শুনিয়েও ফেলতুম হয়তো একদিন...আমি অবশ্য তেমন পড়তে পারি না। তা আর হচ্ছে কই?' শান্তির চোখে জল।

তা আর হয়নি কোনো দিন। জীবনানন্দ দাশ, আপনি আর জাগলেন না। ২২ অক্টোবর রাত সাড়ে ১১টায় আপনি মারা গেলেন।

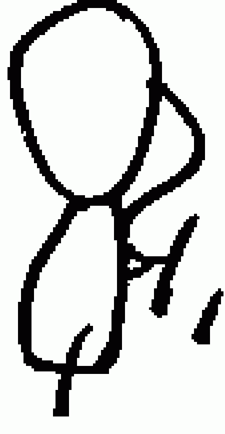
তারপর বড় মানুষেরা, কবিরা, লেখকেরা আসতে লাগলেন পরদিন। আগেও এসেছিলেন অনেকেই, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা, যেমন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র

রায়। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন ও আপনার সুচিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এমনকি *শনিবারের চিঠির* সজনীকান্ত দাস। বড় বড় মানুষের হস্তক্ষেপে আপনার দেহটা আর লাশকাটা ঘরে নিতে হলো না।

এই সব তাবড় লোকের আনাগোনার মধ্যে কেউ আলাদা করে লক্ষ করল না, জানল না, শান্তি মেয়েটা কোথায় গেলেন। কী করলেন!

তাঁর চোখ দিয়ে আলাদা করে কোনো জল গড়িয়ে পড়েছিল কি না!

কিন্তু শান্তি আপনার শবযাত্রী দলের পেছন পেছন একান্তে নিভৃতে হেঁটে গিয়েছিলেন, শবযাত্রা আপনার একসিডেন্টের জায়গাটা হয়েই যাচ্ছিল, আশ্চর্য সেই ট্রাম লাইনের মধ্যখানে দুর্ঘটনাস্থলে সবুজ ঘাস ছিল, শান্তি সেদিকে তাকিয়ে খানিকটা বিস্মিত হলেন, তারপর আবার হাঁটতে লাগলেন মৃদুপায়ে। চিতাগ্নি জ্বলে উঠল। নিভেও গেল একসময়। সবাই ফিরে গেলেও তিনি সেই ভস্মাধারের পাশেই রয়ে গিয়েছিলেন আরও অনেকক্ষণ...একাকী...



সব পাখি ঘরে ফেরে

প্রিয় জীবনানন্দ দাশ,

আমরা বনলতাকে পেয়েছি, শান্তিকেও পাওয়া গেল। কিন্তু কী হবে নাটোরের?

এই সমস্যারও সমাধান শেষতক পেয়ে যাচ্ছি এবার। এও আপনার ডায়েরিতেই।

ট্রেনে যেতে যেতে আপনি যে একবার একজন নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে কথা আপনি লিখে রেখেছেন আপনার ডায়েরিতে। অবশ্য রাস্তায় নারীমুখ দেখে মুগ্ধ হওয়ার ঘটনা আপনার জীবনে আরও ঘটেছে, দিনলিপিতে সেসবের উল্লেখ আরও পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে লেখা আপনার দিনলিপিতে আপনি লিখছেন, 'বনগাঁওয়ের (স্টেশনের) সেই নারীটি—অপূর্ব চিত্তহারী—আমার সিট তাকে দেওয়া হলো! সে নেমে গেল ঝিকুরগাছি ঘাটে। এই অনন্ত সময়প্রবাহের মধ্যে আমি কি আর কোনো দিনও তাকে দেখব?'

আমরা জানি যে *বনলতা সেন* ও *রূপসী বাংলা* প্রায় একই সময়ে লেখা। ১৯৩৪-এ মোটামুটি।

বনগাঁও থেকে উঠে ঝিকরগাছায় নামে যে যাত্রী, যাকে আপনার আসন আপনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, যে আপনার সমস্ত হৃদয়মনকে দ্রবীভূত করেছিল, যাকে আর কোনো দিন দেখবেন না, সে কোথায় যাচ্ছিল?

ওদের কথাবার্তা থেকে আপনি নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছিলেন, ওই পাখির নীড়ের মতো চোখ-মেয়েটির বাড়ি নাটোরে। কাজেই বনলতা সেন ট্রেনের কামরায় কিছুক্ষণের জন্যে দেখা নাটোরের অধিবাসিনী কোনো এক নারী।

আর পাখির নীড়ের মতো চোখ বলতে আপনি সব সময়ই বুঝিয়েছেন একটা শান্তির নীড়কে, যেখানে দু দণ্ড জিরোবার মতো, থিতু হওয়ার মতো একটু ঠাঁই পাওয়া যায়, আপনার এ কবিতার অনুবাদের সময়ও সেই কথাটা বলেছেন আবারও। দিল্লির মতো অপরিচিত দূরবর্তী স্টেশনে নেমে পরিচিত ব্রাহ্ম বন্ধুজনকে দেখে আপনার মনে এসেছিল পাখির নীড়ের মতো শান্তি; আর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে (১৪.৯.১৯৪৪) আপনি লিখেছিলেন, 'Kirkman-এর Banalata খুবই ভালো হয়েছে, সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি। এই কবিতাটির এক জায়গায় 'raising her bird's-nest eyes' আছে, "পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে"র এত বেশি literal translation না করে কিছুটা ভাবানুবাদ করতে পারা যায় না কি? বাংলায় আমি নীড় নয় নীড়ত্বের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম।"

তার মানে কী?

বনলতা কে? পাখির নীড়ের মতো চোখ মানে কী? এ হলো ঘরে ফেরবার শান্তি। কোথায় সেই শান্তি পাওয়া যাবে?

আর কোথায়। এই বাংলায়! বনলতা সেনের মতো দু দণ্ড শান্তি আপনাকে কে দেবে, আর কে, এই ধানসিড়িটির তীর ছাড়া! কাজেই বনলতা সেনের মুখ আসলে বাংলারই মুখ।

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে কার্তিকের এই নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠালছায়ায়...

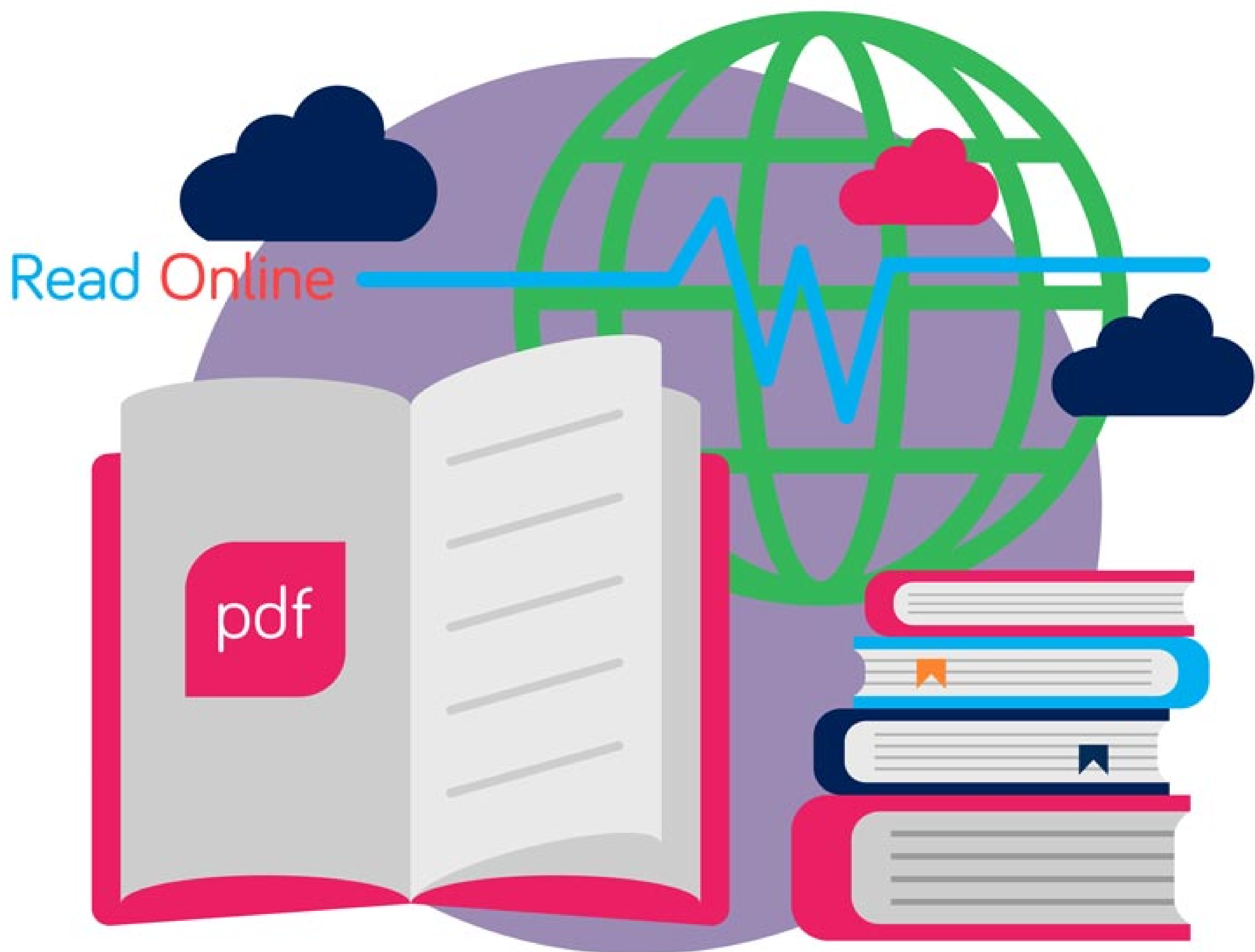
কার্তিক মাসেই আপনি মরে গেলেন, বাংলার মুখকে খুব বেশি ভালোবেসে, ধানসিড়ির তীরটিকে সবচেয়ে শান্তির নীড় ভেবে নিয়ে, কুয়াশায় ভেসে ভেসে আবার আপনি আসছেন এই আমাদের কাঁঠালছায়ায়, রোজ, অনিঃশেষ, আপনার আর আপনার জন্যে আমাদের অপরিসীম ভালোবাসায় মিলেমিশে একাকার হয়ে...

তবুও আপনার মনে সংশয়, অন্তত একটি, শুধু একটিও কি এমন

কবিতা আপনি লিখেছেন, যা হয়ে উঠেছে সুপ্রিম পোয়েট্রি, যে একটা মাত্র কবিতা বেঁচে থাকবে আপনার মৃত্যুর পরেও! বুকের ভেতরটায় কী যে হাহাকার করে উঠছে, প্রিয় কবি, চোখ ভিজে আসছে এক ফোঁটা অব্যাখ্যাত অশ্রুতে।

আপনি আমাদের ভালোবাসার অশ্রুটুকুন গ্রহণ করুন।




Read Online
pdf